পথিকৃৎ

অক্টোবর ২০২৫

একষট্টি বর্ষ ⊞ চতুর্থ সংখ্যা
আশ্বিন ১৪৩২ ⊞ অক্টেবর ২০২৫

সম্পাদক : স্বপন ঘোষাল

প্রচ্ছদ : সমাজতান্ত্রিক চিনে মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে নির্মিত একটি ভাস্কর্য

পথিকৃৎ
৮৮বি বিপিন বিহারি গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২
e-mail: pathikritpatrika@gmail.com
দাম : ৫০ টাকা

সূচি

⊞ সম্পাদকীয় ০৩
⊞ শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে —মাও সে তুং ০৫
⊞ প্রাণের উৎস —সুবীর বসু রায় ০৯
⊞ ভারতীয় সমাজে শ্রেণি বিভাজন তথা শ্রেণি সংগ্রামের সূচনা বিন্দু —তরুণকান্তি নস্কর ১৭
⊞ অ্যাবসার্ড ড্রামা —কাঞ্চন দাশগুপ্ত ২৭
⊞ বাংলাভাষা, বাংলাদেশ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনীতি —অঞ্জনাভ চক্রবর্তী ৩৫
⊞ পুঁজিবাদ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন —দিব্যেন্দু মাইতি ৪৩
⊞ প্রাসঙ্গিক ছোটগল্প ও সময়ের দাবি —অনিন্দিতা জানা ৫৯
⊞ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আরএসএস —অনুপা ঘোষ ৬৭
⊞ কাকোরী সংগ্রামের শতবর্ষ —চঞ্চল ঘোষ ৭৬

পথিকৃৎ

সাংস্কৃতিক দ্বিমাসিক

- জীবন তথা সমাজ সম্পর্কে যে-কোনও মননশীল লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- পথিকৃৎ-এ লেখা মনোনয়নের মাপকাঠি লেখা, লেখক নয়।
- বিভিন্ন বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকের যুক্তিগ্রাহ্য মতামত, বিরোধী হলেও, ছাপা হয়।
- অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাতে এবং লেখার সঙ্গে লেখকের ঠিকানা, ফোন ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- রচনা মনোনয়ন সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

পাস্তুর
Phone 03229-295026 Mobile 8348313666
E.Mail : pasteur.p.lab@gmail.com
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী

আল্ট্রাসোনোগ্রাফী
ইকোকার্ডিওগ্রাফী
কালারডপলার

ডিজিট্যাল এক্স-রে
প্যাথলজি
ই.সি.জি.

প্রত্যহ ঃ সকাল ৭টা - সন্ধ্যা ৭টা
বেলদা (থানার সামনে), পশ্চিম মেদিনীপুর

সম্পাদকীয়

দক্ষিণ আমেরিকার বামপন্থী লেখক এদুয়ার্দো গ্যালেয়ানো বর্তমান সময়কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘We live in a world where the funeral matters more than the dead, the wedding more than love and the physical rather than the intellect. We live in the container culture, which despises the content.’’ আধারসর্বস্বতা বা বিপণনযোগ্যতা যে আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বড়ো হয়ে উঠতে চাইছে, আর তার আড়ালে ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, অন্তরের সম্পদ, মানুষের চোখ মেলে তাকালে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে উৎসবের মেজাজ। বিগত বছর এই সময় আরজিকর কাণ্ড নিয়ে শহর-রাজ্য-দেশ যখন আন্দোলনে উত্তাল, লজ্জাহীন শাসকের উপদেশ ছিল, ‘এবার উৎসবে ফিরুন।’ প্রতিবাদী জনতা উত্তর দিয়েছিল, ‘উৎ-শবে ফিরছি না’। তারপর বছর পেরিয়েছে, আরেকটি উৎসব সমাগত। আরজিকরের অভয়া-সহ দেশজুড়ে আরও অসংখ্য নির্যাতিতার বিচার মেলেনি, এবং আমাদের চারপাশে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে শবের মিছিল, মৃত এবং জীবন্মৃত মানুষের। চাকরি হারানো শিক্ষক সুবল সোরেন, কর্মক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন সহ্য না করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া আশাকর্মী সুস্মিতা মাইতি, কলকাতার রাস্তায় গাড়ি বিস্ফোরণে জ্বলে যাওয়া ডেলিভারি বয় সৌমেন মণ্ডলের দেহ বিচারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের উৎসবের দ্বারপ্রান্তে। দাঁড়িয়ে আছে অবৈধ খাদানের ধ্বসে বা ম্যানহোলের বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারানো শ্রমিক, অবরুদ্ধ গাজায় মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ মদতে কুড়ি হাজার শিশুর মৃত্যুর পরেও গড়ে প্রতি এক ঘন্টায় প্রাণ হারানো একটি করে ফুলেল শিশু। আমাদের চোখের সামনে বা আড়ালে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন অন্যায়, অত্যাচারের চিত্র। বাংলা ভাষায় কথা বলার ‘অপরাধে’ গরিব, সংখ্যালঘু মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলছে, এসআইআর-এর নামে ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। আবার এই কলকাতার বুকে বিশিষ্ট কবি জাভেদ আখতারের আসা আটকে দিচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি, রাজ্য সরকারও নিকৃষ্ট ভোট-রাজনীতির স্বার্থে এই অন্যায় মেনে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং নীতি আয়োগের ঘোষণায় ভারতের অর্থনীতিতে যখন উন্নয়নের জোয়ার বইছে, তখন তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, দেশের ওপরতলার এক শতাংশ মানুষের হাতে ৪০ শতাংশ জাতীয় সম্পদ, নিচের তলার পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ কোনওক্রমে কুড়িয়ে নিচ্ছে জাতীয় সম্পদের ৩ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের ১৯৩ টি দেশের মধ্যে ভারত আছে ১৩০ নম্বরে, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৭ টি দেশের মধ্যে ১০৫ নম্বরে, স্বাস্থ্য পরিষেবায় ১৯৫ টি দেশের মধ্যে ১৪৫ নম্বরে। আয়ের অসাম্যের বিচারে আজকের ভারত দুনিয়ার ন’ নম্বর স্থানে, এদেশের আর্থিক বৈষম্য এখন বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতের চেয়েও বেশি। আফগানিস্তানে ভূমিকম্পের স্তূপে চাপা পড়া রক্তাক্ত মহিলারা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তালিবানি শাসনের ভয়ে তাদের টেনে তুলছে না পুরুষ উদ্ধারকারীর দল। পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য আমেরিকার বুকে প্রবল আর্থিক বৈষম্য, জাতিবিদ্বেষ, গোলাগুলি, নিরীহ মানুষের মৃত্যু। প্রতিবেশী নেপাল হোক বা দূরের ইউরোপ-আমেরিকা - অন্ধকার, অস্থিরতা এবং নাচার মানুষের ক্ষোভ-বিদ্রোহ বিশ্বের মানচিত্র জুড়েই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘‘মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন।... প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী-কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।’’ মনুষ্যত্বের শক্তিকে অনুভব করে

বৃহৎ হতে পারা, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমার বাইরে গিয়ে আর পাঁচটা মানুষের সুখদুঃখের সাথে, মানব সভ্যতার প্রবাহের সাথে অন্তরের সংযোগ খুঁজে পাওয়ার এই উৎসব ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে আমাদের আঙিনা থেকে। শুধু এই বাংলার আশ্বিনের শারদপ্রাতেই নয়, এই দেশ-এই গোলার্ধ- এই সমাজ- সভ্যতার কোনও প্রান্তেই আজ মানুষের সত্যিকারের উৎসবের সেই আলো নেই, আনন্দ নেই। কান পাতলেই ভেসে আসে অসহায় মানুষের কান্না আর মানব সম্পর্কের, অনুভূতির, বিশ্বাসের ভাঙনের শব্দ।

তাহলে এই বিপন্ন সময়ে, শিল্প-সাহিত্যের কাছে মানুষ কী পেতে পারে? একটি বই, একটি গল্প-কবিতা-উপন্যাস বা প্রবন্ধ মানুষের সমস্যাসঙ্কুল বিধ্বস্ত জীবনের কোন কাজে আসবে? কীভাবে তাকে পথ দেখাবে, বা দেবে আলোর সন্ধান? এই প্রশ্ন প্রত্যেক সচেতন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীর মনে দেখা দেয়। এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে, এবছর মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেড়শো'তম জন্মবর্ষ। কবি গোলাম কুদ্দুসের পরিচিত চাষীর ছেলে গওসল, শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিল। কুদ্দুস তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে কমিউনিজম কোথায়?' সে বলেছিল, ''তা জানি নে। তবে এটা জানি তাঁর বই না পড়লে আমি কমিউনিস্ট হতে পারতাম না।... আমি ওদেরকে ভালোবেসে ফেললাম।... রমা ও রমেশের দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়। তারপর আমার মনে হল আমার চারপাশে এত দুঃখী লোক..! আমি তখন খুঁজে খুঁজে এক লাইব্রেরী বের করলাম। সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের বই এনে পড়তে লাগলাম। যতই পড়ি ততই দেখি, দুঃখ এক রকমের নয়, বহু রকমের।'' শরৎ সাহিত্যের গভীর চর্চা করে আমাদের খুঁজতে হবে সেই অমূল্য ধন, যা গওসলের মতো অতি সাধারণ একটি কৃষক পরিবারের ছেলের জীবনের পথকে পাল্টে দিয়েছিল, তাঁকে নিজের দুঃখকে গোটা দুনিয়ার দুঃখী মানুষের ব্যথার সাথে মিলিয়ে দেখতে শিখিয়েছিল। এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'মা' উপন্যাসের কথা, যেখানে শ্রমিক বস্তির ছেলে পাভেল একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে এক নতুন আদর্শের সন্ধান পেয়ে। তাদের ক্লেদাক্ত জীবনে সেই আদর্শের আলো নিয়ে আসছে কিছু অন্য ধরনের বই। পাঠচক্রের এক সদস্য নাতাশা উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, ''যারা বলছে আমাদের সব কিছুই জানা দরকার, তারা ঠিক কথাই বলছে। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বললে তবেই তো যারা আঁধারে আছে তারা আমাদের দেখবে। সব কিছুর ঠিক আর সাচ্চা জবাব আমাদের হাতের কাছে থাকা চাই। সুতরাং যত সত্য আর যা কিছু মিথ্যা সবই আমাদের জানতে হবে পুরোপুরি... শুধু একপেট খেতে পাওয়াটাই আমাদের সব নয়। যারা আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, আমাদের চোখে ঠুলি এঁটে রেখেছে, তাদের দেখাতে হবে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। আমরা বোকা নই, জানোয়ারও নই যে পেট পুরে খেতে পেলেই খুশি থাকবে। আমরা বাঁচতে চাই, সাচ্চা মানুষের মতো বাঁচতে চাই! শত্রুদের দেখাতে হবে, যত নীচেই তারা আমাদের ফেলে রাখুক, যত অত্যাচারই করুক, আমরা মানুষ; এবং জ্ঞানের মাপকাঠিতে তাদের সমান হতে বাধা নেই, এমনকি তাদের চেয়ে বড় হতেও...।'' ঘুমিয়ে পড়া, মরে যাওয়া মনে এই জানার, বোঝার অদম্য ইচ্ছেটাকে জাগিয়ে তোলার, জ্ঞানের আলো জ্বালানোর ক্ষমতা আজও আছে শিল্পের, আছে সাহিত্যের। আগামীর শিল্প-সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে এখান থেকেই। যে শিল্প পাভেল বা নাতাশার মতো কোটি কোটি মুক্তিকামী জনগণের জীবন সংগ্রামের সাথে নিজেকে যুক্ত করবে, তাদের সাচ্চা মানুষ হওয়ার পথ দেখাবে, নিজেও সেই উত্তাপে ক্রমশ হয়ে উঠবে আরও শাণিত, আরও মর্মভেদী।

সাহিত্য চর্চার এই পথটি অবশ্যই মসৃণ নয়, কোনওদিন মসৃণ ছিল না। গ্যালেয়ানো কথিত 'প্যাকেজিং সংস্কৃতি' স্বভাবতই সাহিত্যের এই প্রতিস্রোতকে রুখতে চাইবে, বাজারচলতি স্থূলতার দিকে ভাসিয়ে দিতে চাইবে মানুষকে। তাকে পরাস্ত করেই এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে, সভ্যতার তীব্র সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, ''মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপমান মনে করি।'' আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ মানুষের মন যখন এই পরাভবকেই চরম বলে মেনে নিতে চায়, সেই মনে নতুন করে মানবতার প্রতি আস্থা-ভরসা জাগানোই আজকের শিল্প-সাহিত্যের মহত্তম দায়িত্ব এবং কর্তব্য। □

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে

মাও সে তুং

(বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রূপকার মাও সে তুং-এর প্রয়াণের ৫০ বর্ষ স্মরণে
১৯৪২ সালে ইয়েনান ফোরামের মূল্যবান আলোচনা থেকে নির্বাচিত অংশ)

...কমরেডস, আমাদের ফোরাম এই মাসে তিনটে সভা করেছে। সত্যের সন্ধানে আমরা তেজোদ্দীপ্ত বিতর্ক করেছি। এই বিতর্কে অনেক পার্টি ও পার্টি বহির্ভূত কমরেড অংশগ্রহণ করেছেন...। আমার বিশ্বাস এর ফলে শিল্প ও সাহিত্যের আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রভূত উপকার হবে।

একটা সমস্যা আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞা থেকে শুরু করব না, শুরু করব বাস্তব থেকে। আমরা যদি পাঠ্য পুস্তকে লিখিত শিল্প সাহিত্যের সংজ্ঞা থেকে শুরু করি এবং তারপর তাকে বর্তমান দিনের শিল্প সাহিত্যের আন্দোলনের পথ নির্দেশক হিসাবে প্রয়োগ করি তবে আমরা ভুল করব...। আমরা মার্কসবাদী। আর মার্কসবাদ শিখিয়েছে সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে আমরা বিমূর্ত সংজ্ঞা থেকে শুরু করব না, শুরু করব বাস্তব ঘটনা থেকে। এবং এই বাস্তব ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করেই আমরা নিয়ম নীতি, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নির্ধারক নিয়মাবলি ঠিক করব। শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করব।...

প্রথম কথা হ'ল, শিল্প-সাহিত্য কাদের জন্য? মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে লেনিন, এই প্রশ্নের সমাধান বহুআগেই করেছেন। সেই ১৯০৫ সালে লেনিন জোরের সাথে বলেছিলেন আমাদের শিল্প সাহিত্যের ‘কোটি কোটি শ্রমজীবী জনগণের’ সেবা করা উচিত। জাপ বিরোধী এলাকায় শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কাজ যারা কাজ করছেন, সেই সব কমরেডদের কাছে মনে হতে পারে সমস্যার সমাধান ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে এবং আর আলোচনার কোনো দরকার নেই। বাস্তবে, বিষয়টা এরকম নয়। অনেক কমরেডই এখনও সমাধান খুঁজে পাননি। এর ফলে শিল্প-সাহিত্যের নির্ধারক নিয়মাবলি সম্পর্কে তাদের হৃদয়াবেগ, রচনা, ক্রিয়াকর্ম এবং মতামত জনগণের প্রয়োজন ও ব্যবহারিক সংগ্রামের সাথে কমবেশি বেমানান হবেই।

...আমাদের কাছে জনগণের জন্যই শিল্প সাহিত্যের প্রয়োজন...। আমরা আগেই বলেছি, বর্তমান সময়ে চিনের নতুন সংস্কৃতি হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী...। বর্তমান দিনে জনগণের জন্য সবকিছু সর্বহারার নেতৃত্বে হতে হবে। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে কোনো কিছুই জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে না। স্বাভাবিকভাবেই, নতুন সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। আমরা অবশ্যই আমাদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যকে কাজে লাগাবো। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অতীত চিন ও বিদেশের দেশগুলো যে মহোত্তম সম্পদ যুগ যুগ ধরে আমাদের দিয়ে গেছে তাকে আমরা অবশ্যই ব্যবহার করব। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হবে জনগণের সেবা করা। অতীতের শিল্প-সাহিত্যের প্রকরণকে ব্যবহার করতে আমরা অস্বীকার করব না। কিন্তু পুরনো এই প্রকরণ আমাদের হাতে নতুন মর্মবস্তু দ্বারা সমৃদ্ধ হবে এবং তা জনগণের সেবায় বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করবে।

এই জনগণ বলতে আমরা কাদের বোঝাব। বোঝাব জনসাধারণের ব্যাপকতর অংশকে, আমাদের দেশের ৯০

শতাংশেরও বেশি মানুষকে। এরা হলেন শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও পেটি বুর্জোয়ারা। এই কারণে, সর্ব প্রথমে আমাদের শিল্প সাহিত্যকে বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রেণি শ্রমিকদের জন্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তা হতে হবে বিপ্লবের সবচেয়ে মিত্রশক্তি বিপুল সংখ্যক কৃষকদের জন্য। তৃতীয়ত, তা হতে হবে সমস্ত শ্রমিক কৃষকদের জন্য।... চতুর্থত, তা হতে হবে শহরাঞ্চলের পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষদের জন্য, হতে হবে পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্য। এই দুই অংশও আমাদের বিপ্লবের মিত্র...।

আমাদের শিল্প সাহিত্যকে এই চার ধরনের মানুষের জন্য হতে হবে। এদের সেবা করার জন্য আমরা পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করব না, গ্রহণ করব সর্বহারা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান দিনে, যে সব লেখকরা ব্যক্তিবাদী, পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন তারা বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের যথার্থ সেবা করতে পারবেন না। তাদের আগ্রহ মূলত একটা অল্প সংখ্যক পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'কাদের জন্য লিখব' এই সমস্যার সমাধান যে আমাদের অনেক কমরেডরা করতে পারে না, এই হল তার আসল কারণ...।

'কাদের জন্য লিখব' এই বিষয়টা একটা মৌলিক প্রশ্ন। এ হল নীতির প্রশ্ন। ...আমরা বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করি। তাদের বলি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। জনগণের মধ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিই, সত্যিকারের বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ...আমরা মার্কসবাদকে অধ্যয়ন করব, সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝব। কিন্তু মার্কসবাদ বলতে আমরা বুঝি জীবন্ত মার্কসবাদকে, যা জনগণের জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মার্কসবাদ বলতে আমরা মার্কসবাদের শব্দ সমষ্টি বুঝি না।...

কাদের সেবা করব এই বিষয়টা সমাধানের পর প্রশ্ন হল কিভাবে সেবা করব। আমাদের কয়েকজন কমরেডের কথায় বলতে গেলে মানোন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করব, না কি জনপ্রিয়তার দিকে আমরা বিশেষভাবে নজর দেব?

অতীতে, কোনো কোনো কমরেড, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয়তার বিষয়টাকে ছোট করে দেখতেন, অবহেলা করতেন। মানোন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু একপেশে ভাবে তা করা, একান্তভাবে তা করা, তাকে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে যাওয়া একটা ভ্রান্ত চিন্তা। 'কাদের জন্য লিখব' এই সমস্যার সঠিক সমাধানের বিষয়টি এ ক্ষেত্রেও প্রকাশ পায়। যেহেতু এই সমস্ত কমরেডদের কাছে 'কাদের জন্য লিখব' এই বিষয়টি পরিস্কার নয়, তাই 'মানোন্নয়ন' ও 'জনপ্রিয় করার' সঠিক মাপকাঠিও এদের হাতে নেই এবং এই দুটো বিষয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনে তারা আরও অক্ষম। আমাদের শিল্প-সাহিত্য মূলত শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের জন্য। তাই 'জনপ্রিয়করণ' বলতে বোঝায় শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের কাছে জনপ্রিয় করা এবং মানোন্নয়ন বলতে বোঝায় তাদের বর্তমান স্তর থেকে উন্নত করা। তাদের মধ্যে কোন বিষয়টা আমরা জনপ্রিয় করব? যা দরকার এবং যা সামন্তী-ভূস্বামী শ্রেণি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করবে আমরা কি তাকে জনপ্রিয় করব? যা দরকার এবং যা বুর্জোয়া শ্রেণি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করবে আমরা কি তাকে জনপ্রিয় করব? যা দরকার এবং যা পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তৎক্ষণাৎ জনপ্রিয় করবে আমরা কি তাকে জনপ্রিয় করব? না, এর কোনোটাই আমরা করব না। আমরা শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের যা প্রয়োজন এবং যা তারা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে পারে তা সৃষ্টি করব। তাই শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের শেখানোর আগে আমাদের দরকার তাদের কাছ থেকে শেখা। মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য, মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা ভিত্তি থাকা দরকার। এক বালতি জলের কথা ধরুন। যদি কোনো জমি না থাকে তবে তাকে কোথা থেকে তুলবেন? শূন্য থেকে তুলবেন? তাহলে শিল্প-সাহিত্যকে কোন ভিত্তি থেকে তুলতে হবে? সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তি থেকে? বুর্জোয়া ভিত্তি থেকে? পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ভিত্তি থেকে? এর কোনটি থেকেই নয়। আমাদের ভিত্তি হবে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকরা। এর অর্থ এ নয় যে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের আমরা সামন্তী শ্রেণি, বুর্জোয়া শ্রেণি বা পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর স্তরে নিয়ে যাব। এর অর্থ হল শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকরা নিজেরা যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, যে দিকে সর্বহারা শ্রেণি এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা শিল্প সাহিত্যকে সেই স্তরে উন্নীত করব। এ ক্ষেত্রেও শ্রমিক, কৃষক, সৈনিকদের, কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে।...

শেষ বিচারে, সমস্ত শিল্প সাহিত্যের উৎস কী? নির্দিষ্ট সামাজিক জীবনধারা মানব মস্তিষ্কে যেভাবে প্রতিফলিত হয়, আদর্শগত রূপে শিল্প সাহিত্য হল তারই সৃষ্টি। বিপ্লবী শিল্প সাহিত্য হল বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত জনগণের জীবন ধারার ফসল। জনগণের জীবনধারা হল শিল্প সাহিত্যের কাঁচামালের খনি। এই কাঁচামাল স্বাভাবিক রূপেই থাকে। এই কাঁচামাল অশোধিত, কিন্তু এই কাঁচামাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সজীব ও মৌলিক প্রকৃতির। এই সজীব বাস্তবতাই সমস্ত শিল্প সাহিত্যের অফুরন্ত উৎস, তাদের একমাত্র উৎস।

তারা একমাত্র উৎস, কারণ অন্য কোনো উৎস থাকতে পারে না। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, অন্য দেশের বইপত্র ও প্রাচীন সাহিত্যও কি আর একটা উৎস হতে পারে না? বাস্তবে, অতীতের শিল্প-সাহিত্য উৎস নয়, তা একটা স্রোতধারা, তা বিদেশীদের ও আমাদের পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টি। তাঁরাও তাঁদের সময়কার জনগণের জীবনধারা থেকেই শিল্প সাহিত্যের মাল মশলা সংগ্রহ করেছেন। আমাদের শিল্প সাহিত্যের ঐহিত্য থেকে সর্বোত্তম সম্পদ আমরা সংগ্রহ করব, যা শুভফলপ্রদ তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমরা আত্মস্থ করব এবং তাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করব। ...আমরা কখনই অতীত ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করব না, বিদেশের জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করব না, তাদের কাছ থেকে শিখতে অস্বীকার করব না। যদি তারা সামন্তী বা বুর্জোয়া শ্রেণির রচনা হয় তবুও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আমরা অস্বীকার করব না। কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে বা তাদের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা আমাদের সৃজনশীল কাজকে থামিয়ে দেব না। অতীত বা বিদেশকে ভাবনা চিন্তাহীন ভাবে অনুকরণ হ'ল শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বন্ধ্যা ও ক্ষতিকারক প্রবণতা। চিনের বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকরা, সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবশ্যই জনগণের মধ্যে যেতে হবে। সর্বান্তকরণে, দ্বিধা না রেখেই দীর্ঘ সময়ের জন্য আপনারা শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক জনগণের মধ্যে যান, সংগ্রামের উত্তাপ অনুভব করুন, একমাত্র, সর্বোত্তম, মহোত্তম উৎসের দিকে যান। যান নানা ধরনের মানুষকে, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে, সব ধরনের মানুষকে বোঝার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য। অনুভব করুন বিভিন্ন ধরনের জীবন ও সংগ্রামকে, শিল্প-সাহিত্যের সব ধরনের কাঁচামালকে। একমাত্র তাহলেই আপনারা সৃজনশীল কাজ শুরু করতে পারবেন।

যদিও মানুষের সামাজিক জীবন শিল্প সাহিত্যের একমাত্র উৎস এবং মর্মবস্তুতেও তা অনেক সমৃদ্ধ, কিন্তু মানুষ শুধু জীবনকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, শিল্প সাহিত্যও তার প্রয়োজন। শিল্প-সাহিত্য ও জীবন, দুইই সুন্দর। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে যে জীবন প্রতিফলিত হয় তা অনেক উন্নত স্তরের, অনেক আবেগতাড়িত, আরও ঘণীভূত, অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, প্রায় নিখুঁত এবং তাই দৈনন্দিন জীবনের তুলনায় অনেক সার্বজনীন। বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যকে বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া নানা ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। জনগণ যাতে ইতিহাসকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। ধরুন, একদিকে আছে খিদে, ঠাণ্ডায় কষ্ট ও নির্যাতন এবং অন্যদিকে আছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। সর্বত্রই তা আছে এবং মানুষ তাকে স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে করে। প্রাত্যহিক এই ঘটনার প্রতি শিল্পী সাহিত্যিকদের মনোযোগ দিতে হবে এবং তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত কাজ করছে তা দেখিয়ে দিতে হবে। তাদের এমন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে যা মানুষকে জাগাবে, তাদের উদ্যমে উৎসাহে উজ্জীবিত করবে, ঐক্যবদ্ধ হতে শেখাবে এবং পরিবেশকে পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করতে শেখাবে। এই ধরনের শিল্প সাহিত্য ছাড়া আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবো না। □

১৯৪২ সালে ইয়েনানে লেখক ও শিল্পীদের সাথে মাও সে তুং

Space Donated by

A
Well
Wisher

প্রাণের উৎস

সুবীর বসুরায়

প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের যে সকল রহস্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে রহস্যোদ্ঘটনে, অনুপ্রাণিত করেছে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে, আর উৎসাহিত করেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তব সত্যের প্রকৃতি উন্মোচনে, তার ভেতরে পৃথিবীতে জীবনের প্রাথমিক সৃষ্টির ঘটনাটি একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। জড়জগতে, চেতনাহীন, স্পন্দনহীন পৃথিবীতে জীবনের প্রথম পদক্ষেপ কিভাবে ঘটলো। এ চিন্তা যেমন একদিকে কিছু ব্যক্তিকে করে তুলেছে এক রহস্যময় (mystic) শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী, অপরদিকে আর একদল ব্যক্তিকে করে তুলেছে বিজ্ঞানাশ্রয়ী ও সত্যসন্ধানী। এই দ্বিতীয় দলের যুগ-যুগান্তব্যাপী গবেষণালব্ধ ফল, যেটার দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে মানব সমাজের সাম্প্রতিক জ্ঞানভাণ্ডারের ওপরে তা আজ পরিপূর্ণতা লাভের পথে। ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের উন্নত থেকে উন্নততর শিখরে আরোহন করার পথে আজ আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যে আজ আর একথা বিজ্ঞানীকে বলতে কোনও দ্বিধাই অনুভব করতে হয় না যে, জীবনের সৃষ্ট ঘটেছে এক বিশেষ যুগে, ঘটেছে অজৈব জগৎ থেকে জৈব জগতের উৎপত্তি, আর এই জৈব জগতের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ও অজৈব পদার্থের পারস্পরিক মিলন ও বিক্রিয়ার মাধ্যমে, বস্তুজগতে, বস্তর ক্রমবিবর্তনের ধারায় এক বিশেষ স্তরে বস্তুর ভেতরেই শুরু হয়েছে প্রাণের স্পন্দন এবং সৃষ্টি হয়েছে চেতনা, জীব বস্তুরই আরও উন্নততর পর্যায়ে। জীবনের এই 'materialistic basis' সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান ঘটার ফলে বস্তুনিষ্ট বিজ্ঞানীকে আজ আর বলতে কোনও অসুবিধে হয় না যে 'Life is material in nature' তবে সাথে সাথে এটাও মনে রাখা দরকার, "...but it is not an in-alienable property of all matter in general. Life is a special, very complex, form of motion of matter. It is not separated from the rest of the world by an unbridgeable gap, but arises in the process of the development of matter, as a special kind of a qualitatively new organisation of matter, at a definite stage of material development, as a new formerly absent quality." বস্তু মাত্রেই রয়েছে সদানিয়ত পরিবর্তন এবং বস্তুবাদী বিজ্ঞানী মাত্রই জানেন, এ কথাটা সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাধারণভাবে এই সদানিয়ত পরিবর্তন অর্থাৎ 'change in general-ই বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে তার গতির (motion) মাধ্যমে। এখানে গতি অর্থে যান্ত্রিক গতি মনে করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে সংজ্ঞাটিকে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল করা হবে। সুতরাং 'Motion as applied to matter is change in general.' বস্তুর ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে বস্তু সদানিয়ত পরিবর্তনের (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) ধারায় অবস্থান করে। কথাটা জড়বস্তু থেকে শুরু করে, নিম্নস্তরের চেতনাহীন জীববস্তু ও চেতনশীল জীববস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তু কোনও অবস্থায়ই নিশ্চল (fixed বা static) বা অপরিবর্তনীয় (unchangable) নয়। তাই ক্ষুদ্রতম জীব কণিকা প্রোটোপ্লাজমের এই গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল (dinamic) অবস্থা দেখে বিজ্ঞানী প্রোটোপ্লাজম সম্পর্কে বলছেন, "During life it is in a steady dynamic state, and energy furnished by the metabolic mechanishm is constantly required to maintain its structure"। শুধু প্রোটোপ্লাজম নয়, সকল জীবদেহ সম্পর্কেই এ কথার যথার্থতা সন্দেহের অতীত। সুতরাং পরির্তনশীল বস্তুর এই অবস্থার যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটছে, এ বক্তব্যের মাধ্যমে যে, "motion is the mode of existence of matter."

আবার আমাদের পূর্বের আলোচনায় আসা যাক। বস্তু জগতে বস্তুর ক্রমবিবর্তনের ধারায় জীবনের সৃষ্টি অবধি ক্রমবিকাশের ধারাকে পর্যালোচনা করলে এটা বলা যায় যে, প্রথম স্তরে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থের উৎপত্তি ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে এক কালের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা, জৈব পদার্থের সৃষ্টি একমাত্র কোনও-না-কোনও ঐশিক শক্তির মাধ্যমেই সম্ভব, বিজ্ঞানীর অক্লান্ত গবেষণালব্ধ যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে বহুদিন আগেই ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে নানাপ্রকার শক্তিশালী বিকিরণ তথা, বহু প্রাকৃতিক শক্তির পারস্পরিক

ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই যে অজৈব বস্তু থেকে জৈব বস্তুর উৎপত্তি ঘটিয়েছে সেটা বিজ্ঞানী যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিভিন্ন অজৈব পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থের উৎপত্তি এবং তার পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন জৈব পদার্থের ও অজৈব পদার্থের সংযোগে জীবনের উৎপত্তি, এই উভয় ধাপেই, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের ধারাটি সূচিত হয়েছে। বস্তু জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই, বস্তুর পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে যে সত্যটির উপলব্ধি ঘটে তা হল, প্রতি ক্ষেত্রেই, বস্তুর এক স্তর থেকে অন্য কোনও নতুন স্তরে বা অন্য কোনও নতুন বস্তুতে রূপান্তরকালে (যেটা পূর্ব স্তর বা পূর্ব বস্তুর থেকে গুণগতভাবে আলাদা) যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তার পূর্বাবস্থায় পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, আবার গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হবার মাধ্যমে যে নতুন গুণগত বৈশিষ্ট্য-সহ নতুন বস্তুর সৃষ্টি হলো সেটা আবার নতুন পরিমাণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুনতর গুণগত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলে। যেমন বিভিন্ন অজৈব পদার্থের পরিমাণগত সংযোগের মাধ্যমে এই পরিমাণগত পরিবর্তন চলাকালীন কোনও এক সময় নতুন বস্তু অর্থাৎ জৈব পদার্থের সৃষ্টি ঘটলো। সে বস্তু গুণগতভাবে অজৈব পদার্থ থেকে নিঃসন্দেহে পৃথক। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সরল জৈব পদার্থ থেকে শুরু করে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর জৈব পদার্থের সৃষ্টি ঘটলো, সেই আদিম প্রাকৃতিক যুগে, পৃথিবীর বুকে। সৃষ্টি হলো প্রোটিন, শর্করা, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি পদার্থ, জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন জৈব পদার্থ মূলত প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের এবং অন্যান্য জৈব ও অজৈব পদার্থের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে এক বিশেষ পরিমাণগত মাত্রায় যখন পৌঁছলো অর্থাৎ আবার পরিমাণগত পরিবর্তন চলতে চলতে এক বিশেষ অবস্থায় এক নতুন গুণগত পরিবর্তন সূচিত হলো, তখনই সৃষ্টি হলো a new organisation of matter, ঘটলো জড়বস্তুর উত্তরণ জীব-বস্তুতে। রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের সূত্রটির উপলব্ধি ঘটে নতুন রাসায়নিক পদার্থ (chemical entity) সৃষ্টির মাধ্যমে। আর জীব রসায়নের ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবনের উৎপত্তি ঘটলো protoplasm-এ যে বস্তুকে রসায়নবিদের কাছে বরং মিশ্রণ বলেই মনে হবে। কারণ এটা কোনও একক রাসায়নিক পদার্থ নয়। বস্তুবাদী দর্শনের প্রয়োগের ব্যাপকতার এ একটি প্রাচীন নিদর্শন। কারণ সাধারণভাবে রসায়নে কোনও পরিমাণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি কোনও বিক্রিয়া না ঘটে তাহলে যে মিশ্রণটির সৃষ্টি হয় তার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। পরিমাণগত পরিবর্তন যদি কোনও মিশ্রণের ক্ষেত্রেও ঘটে তাহলেও যে তা বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে গুণগত বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম। অনেক সময় চলতি কথায় প্রোটোপ্লাজমকে living substance বললেও একথা মনে রাখতে হবে যে, ‘protoplasm is not a single chemical substance but rather the most complicated colloidal solution known and contains a great variety of substances which are present in different states of complexity, এ যেন অনেকটা রসায়নবিদের যান্ত্রিক মিশ্রণের মতই। বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থের এক বিশেষ আনুপাতিক (পরিমাণগত সম্পর্ক) মিশ্রণ, এক বিশেষ অবস্থায় একটি গুণগতভাবে নতুন মিশ্রণের সৃষ্টি করলো প্রোটোপ্লাজম-এর ক্ষেত্রে, জীবনের মূল প্রকাশ ঘটছে যার মাধ্যমে। অবশ্য তাই বলে protoplasm-কে রসায়নবিদের কোনও যান্ত্রিক মিশ্রণ বিশেষই মনে করলে অতি সরলীকরণের (over-simplification) দোষে আমরা দুষ্ট হবো।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত ভাইরাস ও নিউক্লিক অ্যাসিড (Virus and Nucleic acid) একদিকে যেমন জীবনের উৎস সন্ধানে রত বিজ্ঞানীকে তার সমস্যা সমাধানের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে দিয়েছে বলা যায়, অপরদিকে কিছু কিছু বিজ্ঞানী অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট হচ্ছেন বলে মনে হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সংযোগে গঠিত ভাইরাসের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এটিকে একটি রাসায়নিক পদার্থ হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু যখনই কোনও জীবকোষের সংস্পর্শে সে আসে তখনই দেখা যায় যে এরা সদৃশ-পদার্থ সৃষ্টি করতে (self replication) শুরু করে দিয়েছে। এক ভাইরাস থেকে অন্য ভাইরাসের সৃষ্টি হচ্ছে, যেন শুরু হয়ে গিয়েছে প্রজনন ক্রিয়া যে বৈশিষ্ট্য মূলত জীব-বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও একই বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ পাওয়া গেছে। এখন এ থেকে কেউ কেউ এ পদার্থগুলোকে ‘জীব-অণু’ (living molecule) বলেও অভিহিত করেছেন। এ কথাটা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত নয় বলেই মনে হয়। কখনও কোনও অবস্থাতেই জীবন প্রক্রিয়াটি একটি রাসায়নিক অণু বা রাসায়নিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, তা সে পদার্থটি যতই জটিল হোক না কেন। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সম্মিলিত এক বিশেষ জাতীয় সংগঠনই হচ্ছে জীবন যার ভেতরে রয়েছে কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে

বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'Pauling'ও একভাবে বলেছেন, "Life is a relationship between molecules, not a property of any one molecule" এ ছাড়া জড়-বস্তু থেকে জীব-বস্তুতে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মতো একটি প্রক্রিয়া নয় সেটা বোঝা যায় এ কারণে যে, কোনও রাসায়নিক (thermodynamically directed হয়েও) পরিবর্তনই জড়বস্তু থেকে জীব-বস্তুতে পরিবর্তিত না হয়েই অনাদিকাল চলতে পারে। কেবল একমাত্র "...When organic matter had achieved a high degree of organisation and had acquired diverse propensities through the concatenation of such substances, did primordial life emerge as a new dimension in nature. Matter is perpetuating its own organization" সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোনও বিশেষ একটি রাসায়নিক পদার্থ কোনও অবস্থাতেই জীবন্ত হতে পারে না।

তাই জড়বস্তু থেকে জীববস্তুতে উত্তরণের ক্ষেত্রে ভাইরাসের স্থান নির্ণয় করতে হলে আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। বস্তুর ক্রম-বিবর্তনের ধারায় যে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পুরনো বস্তু থেকে নতুন বস্তুতে উত্তরণ ঘটে, সে ধারাটি যুগপৎ অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন (continuous ও dis-continuous)। পরিবর্তনের ধারার যে পর্যায়ে পরিমাণগত পরিবর্তন চলতে থাকে, সে অবধি পরিবর্তন অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলে। যখন গুণগত উত্তরণ ঘটে নতুন বস্তুতে, তখন এই শেষ স্তরের সঙ্গে তার ঠিক পূর্বতন স্তরের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি ঘটে। সামগ্রিক পরিবর্তন যা গুণগত পরিবর্তনকে সূচিত করে, তার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতা একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বস্তুজগতে বিশেষ বস্তুগুলোর সমন্বয়ে ক্রম-পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুতে জীবন সৃষ্টির প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

জড়বস্তুগুলোর ক্রমান্বয়ের পরিবর্তনের ধারায় যতক্ষণ অবধি পরিমাণগত পরিবর্তনই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ততক্ষণ অবধি পরিবর্তনের ধারাটিও অবিচ্ছিন্ন (continuous) কিন্তু যখনই কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বস্তুর সৃষ্টি হলো তখনই পরিবর্তনের ধারায় দেখা গেল একটি বিচ্ছিন্নতা (dis-continuity বা break)।

জড়বস্তু থেকে জীববস্তুতে আসা অবধি এ রকম একাধিক break থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর ভাইরাস সৃষ্টির স্তরটিও খুব সম্ভবতঃ এ রকম একটি বিচ্ছিন্ন স্তর। অর্থাৎ জড়বস্তুর পারস্পরিক সংযোগকালীন সৃষ্টির কোনও এক স্তরে নতুন বৈশিষ্ট্য-সহ 'ভাইরাসের' উৎপত্তি ঘটেছে। আবার 'ভাইরাস' থেকে যথার্থ জীববস্তুর সৃষ্টি হওয়া অবধি কতকগুলো অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিবর্তনের পর আবার শেষ অবধি গুণগত পরিবর্তনের ফলে একটি নতুন বিচ্ছিন্ন স্তর অর্থাৎ (dis continuous) জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে 'ভাইরাসকে' living non-living-এর মধ্যবর্তী কোন স্তর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীও বলছেন, "Viruses seem to be in the border area between Life and in-animate matter, Some people think that viruses may have been an early stage in the development of living things, and that cells developed when some viruses banded together and surrounded themselves with cytoplasm." ভাইরাস জাতীয় নিউক্লিও-প্রোটিনের স্বাভাবিক অবস্থায় জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রাণ বৈশিষ্ট্যের যে ছাপ পাওয়া যায় তা এ সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

পরিবর্তনের ধারা বিচ্ছিন্ন কি অবিচ্ছিন্ন বা উভয়েই যুগপৎ কি না, এ নিয়ে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল বিজ্ঞানে। এ প্রসঙ্গে জীব-বিজ্ঞানের অপর একটি তত্ত্বের একটু আলোচনা খুব সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Theory of evolution-এর ক্ষেত্রেও এ চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটা উচিত যথার্থভাবে। জীবের ক্রমবিকাশ তত্ত্বে একদল বিজ্ঞানী ধারাটিকে অবিচ্ছিন্ন ও অপর দল এটিকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন মনে করেন অর্থাৎ ধারার প্রতিটি স্তর পরস্পর বিচ্ছিন্ন এটাই তাঁদের বক্তব্য। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ আছে বিভিন্ন species-এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও একটি species-এ তার বৈশিষ্ট্যাদির পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও মৌলিক নতুন species জন্ম নিচ্ছে না, এবং পরিবর্তনের ধারাটিও সেই অর্থে অবিচ্ছিন্ন। এরকম চলতে চলতে অতঃপর এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে, যখন ঘটবে নতুন species-এর উত্তরণ, নতুন গুণগত বৈশিষ্টসহ species জন্ম নেবে, ঘটবে গুণগত পরিবর্তন। আর এই দুই স্তরের মধ্যে থাকবে একটি break বা বিচ্ছিন্নতা। এ সম্পর্কে যথার্থ সম্যক ধারণা থাকলে বিজ্ঞানীরা homo sapiens ও তার ঠিক পূর্ববর্তী species-এয় মধ্যেকার missing link খুঁজে বৃথাই হয়রানি হতেন না। বস্তুত কোনও missing link-ই নেই। homo sapiens-এর সৃষ্টি হওয়াটা সম্ভব হয়েছে একটা গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে, সুতরাং এখানে রয়েছে একটা dis-continuity। এর ঠিক পূর্ববর্তী species-কে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে তবে এ দুইয়ের মধ্যেকার কোন link species পাওয়া যাবে না। যেহেতু এ দুই স্তরের মধ্যে একটা গুণগত

পার্থক্য হয়েছে, সে কারণে এ দুই species-এর মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যাবে যেটা missing link-এর সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে একটা missing link-এর অস্তিত্বের অবাস্তব কল্পনাকে দৃঢ় করতে চাইবে বিজ্ঞানীর মনে।

বস্তুর ক্রমবিবর্তনের ধারায় necessity ও chance (অবশ্যম্ভাবিতা ও সম্ভাব্যতা) এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য নিঃসন্দেহে। এ কথাটা পরিষ্কার বোঝা দরকার যে, জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও পূর্ব-নির্দিষ্টতা (pre-determination) তা সেটা নিউটনের যান্ত্রিক পূর্ব-নির্দিষ্টতাই হোক বা কোনও Absolute Being বা Absolute Idea পূর্ব-নির্দিষ্টতাই হোক কোনটাই কাজ করেনি। Necessity ও Chance জড়বস্তু থেকে জীববস্তুতে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এখানে necessity বলতে নিঃসন্দেহে causal necessity (কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত অবশ্যম্ভাবিতা) বোঝানো হচ্ছে। বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের পারস্পরিক সংযোগের প্রক্রিয়ায় কোনও এক বিশেষ স্তরে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হলো যে তখন অবশ্যম্ভাবী কারণে পরবর্তী ধাপে উত্তরিত হলো যায় ফলে ঘটলো জীবনের উৎপত্তি। এই পূর্ববর্তী স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে পৌঁছবার প্রক্রিয়াটি একটি unique causal process এবং প্রথম স্তরের সঙ্গে পরবর্তী স্তরের রয়েছে necessarial connection বা অবশ্যম্ভাবী যোগসূত্র। সেই অর্থে জীবন সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালো বস্তুর ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটি বিশেষ স্তরে necessity। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, জীবন সৃষ্টির জন্য যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব অপরিহার্য, যে সকল পদার্থের একত্রে উপস্থিতি, এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি তথা বিভিন্ন বিকিরণ যার প্রভাবে জীবন সৃষ্টি সম্ভব হলো, এইসব কিছুর এক বিশেষ সন্ধিক্ষণের যুগপৎ ক্রিয়াটি ঘটার ভেতরে একটা সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার প্রশ্নও ছিল। পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ বছরে একবার এ রকম ব্যাপার ঘটার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সেই অর্থে chance-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ আকস্মিকতা accidental factor-কে অস্বীকার করাটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবপ্রসূত মনে হবে। অবশ্য accident বলতে কোনও অবস্থাতেই কার্যকারণ সম্পর্কহীনতা বোঝায় না। বরং যে কোনও আকস্মিক ঘটনা ঘটাটাও কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারাই পরিচালিত হয় (accident is also causally determined)। এবং এখানে এই অর্থেই causally determined যে প্রতিটি জৈব পদার্থ যা জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাদের সৃষ্টি হওয়াটা এক বিশেষ অবস্থায় necessity পর্যায়ে এসেছে। কারণ অজৈব পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার একমাত্র অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই এসেছে জৈব পদার্থগুলো। আবার এ সকল জৈব পদার্থের সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্ঘাতপূর্ণ অবস্থায় তাদের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি হওয়ায় সম্ভাবনারও জয় হলো। একই সঙ্গে আবার এর গূঢ় কারণ সুপ্ত রইলো এ সকল জৈব অজৈব পদার্থের রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্টগুলোর ভেতরে। এ সকল জৈব পদার্থের একত্রে সৃষ্টি ও তৎসহ সাহায্যকারী শক্তিগুলোর একত্রের অবস্থান যে অবস্থার সৃষ্টি করলো তাতে জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা আকস্মিকতার ভূমিকা থাকলেও মনে রাখতে হবে যে, সে আকস্মিকতা কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত তো নয়ই বরং সর্ব অবস্থায়ই এই কার্য-কারণ সম্পর্কের মাধ্যমে chance ও necessity-র যুগ্ম ক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে জীবনের। সুতরাং pre-determination-এর প্রশ্ন ওঠে না। বস্তু জগতে পরিবর্তনের ধারায় সব সময়েই কোনও একটি বিশেষ স্তর তার পরবর্তী স্তরটিকে নির্দিষ্ট করছে, আর সেই কারণেই এই দুটো স্তরের ভেতরে রয়েছে একটা causal relation।

জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল পদার্থ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড। এ প্রসঙ্গে Engels-এর একটি উক্তি প্রবিধানযোগ্য, ‘Life is the mode of existence of protein bodies, the essential element of which consists in continual metabolic interchange with the natural environment outside them’ এখানে protein bodies বলতে কেবলমাত্র protein-ই বোঝানো হয়নি, কারণ এর আগেই protein bodies বলতে এঙ্গেলস্ বোঝাতে চেয়েছেন এমন কিছু যা প্রথমে নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করার পর জীবকোষে পরিণত হচ্ছে। প্রোটিনের সঙ্গে অপর যে পদার্থ জীবনের উৎপত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সেই নিউক্লিক অ্যাসিড, নিউক্লিয়াসের ভেতরই থাকে। প্রায় শতাধিক বৎসর আগে এঙ্গেলসের উক্তির যথার্থতা লক্ষ করে সত্যই চমৎকৃত হতে হয়, কারণ আজকের উন্নততর বৈজ্ঞানিক যুগে যখন বলা হয় যে, “The major thesis... is the idea that what we may call 'life' started with the coupling of neuclic acid polymerisation and amino acid polymerisation” (অর্থাৎ protein) ওখন তার সঙ্গে এঙ্গেলসের বক্তব্যের মৌলিক কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না।

এবারে যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা জীবনের বস্তুবাদী উৎসের তত্ত্বকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলেছে সে সম্পর্কে

কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি, শুধু তাই নয়, কিভাবে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রনে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হল, তার আনুমানিক সিদ্ধান্ত তথা জীবন সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, সে সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উঠতে পেরেছেন তা থেকে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর ‘আদিম আবহাওয়ায়’ যে যৌগিক পদার্থগুলো, পারস্পরিক সংযোজন তথা মিলনের মাধ্যমে অন্যান্য পদার্থ তথা জৈব পদার্থের সৃষ্টি করলো, তা হল জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ইত্যাদি বা বিশেষ করে মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জল। এসব পদার্থ সেই আদিম যুগে শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মি, তড়িৎ-শক্তি ইত্যাদির প্রভাবে প্রথমে বিশ্লেষিত হবার পর নতুনভাবে পারস্পরিক সংযোজনের ফলে বহু জৈব পদার্থের সৃষ্টি করলো। কেবলমাত্র কিছু কিছু সাধারণ জৈব পদার্থ সৃষ্টি হওয়াই যে এভাবে সম্ভব তা-ই নয়, মোটামুটি এটা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়েছে যে সংশ্লেষণে অপরিহার্য্য ‘অ্যামিনো অ্যাসিড’ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে অপরিহার্য্য Adenine, Gracil ইত্যাদি জটিল জৈব পদার্থের সৃষ্টিও এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভব। এর স্বপক্ষে কতকগুলো অপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ ফলের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে আনুমানিক পৃথিবীর আদিম পরিবেশ সৃষ্টির পর সেই পরিবেশে উপরোক্ত তিনটি পদার্থের পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কতকগুলো যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললেন। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট আদিম পরিবেশে উপরোক্ত তিনটি যৌগিকের বিক্রিয়ায় কেউ কেউ অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি করলেন, যেমন গ্লাইসিন, অ্যালামিন ইত্যাদি পদার্থ পাওয়া গেল। শর্করা সৃষ্টি করাও সম্ভব হল। এ প্রসঙ্গে মেনাডিন কেলডিসের Adenine সৃষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। একদিকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড (যা প্রোটিন অনু সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য) সৃষ্টি করা যেমন সম্ভব হলো, তেমনি উপরোক্ত বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন যে, নিউক্লিক অ্যাসিডের অপরিহার্য্য পদার্থ Adenine সৃষ্টি করাও সম্ভব ওই একই প্রকারে। নিউক্লিক অ্যাসিডের পক্ষে অপরিহার্য্য অপর একটি যৌগিক পদার্থ gracil সৃষ্টি করাও সম্ভব হলো। শুধু তাই নয় protein-এর সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে এবং যার থেকে protein অণু সৃষ্টি হয়েছে সেই ‘পলিপেপটাইড’ অণু সৃষ্টি করাও সম্ভব হল একই প্রকারে। এমন কি ‘নিউক্লিওটাইড’ নামক অণু যা নিউক্লিক অ্যাসিড নামক পদার্থ গঠনে একটি একক হিসাবে কাজ করে এবং যার সংশ্লেষণ বর্তমানে জীবদেহে ‘এনজাইমের’ জৈব অনুঘটকের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, সেই ‘আদিম পরিবেশে’ সূর্যরশ্মি, নানাপ্রকার বিকিরণ তথা তড়িৎ তাড়নার ফলে এসকল জটিল পদার্থের সৃষ্টি হওয়াটাও কোনমতেই অসম্ভব নয়, এ প্রমাণও পাওয়া গেল। আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটাই প্রতীয়মান হলো যে, জীবনের উৎপত্তির পক্ষে অপরিহার্য্য জৈব পদার্থগুলো পৃথিবীর সেই আদিম পরিবেশে অপেক্ষাকৃত সরল পদার্থ থেকে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এর ফলে সেই আদিম যুগের ‘primitive sea’তে এ সকল জীবন সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য পদার্থগুলো জমা হলো। এই ‘primitive sea’কে বিজ্ঞানী Halden বলেছেন, ‘hot thin soup’, এই hot thin soup-এর ভেতরে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সৃষ্টি হওয়ার মতো জৈব পদার্থ জমা হয়েছিল, যা ক্রমশঃ উপরোক্ত দুটি জটিল জৈব পদার্থের জন্ম দিয়েছে এবং এর থেকেই মূলতঃ জীবন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

এখন ‘ভাইরাস’ ও ‘নিউক্লিক অ্যাসিড’ জীবন সৃষ্টির রহস্যকে যে বহুদিক থেকে স্বচ্ছ করে তুলেছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ভাইরাস ও নিউক্লিক অ্যাসিডের ‘self-duplicate’ (সদৃশ-পদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতা) করার ক্ষমতা যেটা বহু সময়েই জীব-বস্তুর প্রজনন ক্রিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে সম্পর্কেও একটু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

জীব-বিজ্ঞানী মাত্রেই জানেন যে জীবকোষের অন্তর্গত প্রোটপ্লাজমকে মুলতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম। আর এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমকে নিয়ে অক্লান্ত গবেষণার পর ক্রোমোসোমের ভেতরে বিজ্ঞানীরা একটা নতুন পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করলেন, পুর্বেই ক্রোমোসোমের অন্তর্গত যে অংশকে Gene বলতেন বিজ্ঞানীরা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফৎ দেখা গেল যে এ Gene একটা রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া কিছু নয়। এখানে একটা ব্যাপার একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না তা হলো, কোন species-এ বংশ পরম্পরায় যে দৈহিক আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তায় তার প্রধান কারণ এই Gene। যদি parent থেকে offspring transmission কালে Gene-এর কোনও সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে, তাহলে দৈহিক গঠনাকৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও

পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। Gene-এর এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন, যা 'X-ray' বা অন্যান্য radiation-এর সাহায্যে ও পরীক্ষাগারেও করা সম্ভব, তাকেই 'mutation of Gene' বলেন জীব বিজ্ঞানী।

বিস্তৃত আলোচনায় না গেলেও অনায়াসেই বলা যায় যে, Gene-এর 'mutation'-যার দরুণ species-এ সামান্যতম পরিবর্তন ঘটে তার আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক উভয় কারণই বিদ্যমান। Offspring-এর ক্ষেত্রে কোনও পুরনো দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হওয়া বা নতুন কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্ম হওয়া উভয়েই heredity (বংশানুক্রম) ও environment (পরিবেশ)-এর উপরে নির্ভরশীল। আর এই Heredity environment-এর পারস্পরিক প্রভাবের ফলশ্রুতির বার্তাবহ হলো Gene। Gene-এর আবিষ্কার বংশানুক্রমের বস্তুবাদী ভিত্তিকেও দৃঢ় করে তুলেছে (ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রইলো)।

এখন রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে সত্য উদঘাটিত হলো, তা হচ্ছে মূলত এই Gene একটি রাসায়নিক যৌগিক যার নাম বিজ্ঞানীরা দিলেন ডেসাস্কারবো নিউক্লিক অ্যাসিড (Desoxyribo nucleic acid) বা সংক্ষেপে D.N.A.। সহজ করে একেই বলা হয় নিউক্লিক অ্যাসিড। শর্করা জাতীয় পদার্থ Adenine ও তৎ জাতীয় আরও কয়েকটি জটিল ক্ষার জাতীয় নাইট্রোজেন যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও 'ফসফেটের' সহায়তায় গড়ে উঠেছে জটিল রাসায়নিক পদার্থ D.N.A.। সূক্ষ্ম বিশ্লেধণে দেখা গেল যে, উপরোক্ত পদার্থগুলোর সমন্বয়ে এক একটি রাসায়নিক এককের সৃষ্টি হয়, তারপর এই এককগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় অনু গঠন করে যাকে বলা হয় 'পলি-নিউক্লিওটাইড' আর একাধিক পলি-নিউক্লিওটাইডের মিলনে গঠিত হয় D.N.A.। এই জাতীয় বিক্রিয়াকে বিজ্ঞানী বলেন 'polymesisation'। সুতরাং D.N.A.-কে একটি 'polymer' অণু মনে করা যেতে পারে। প্রোটিনের সম্পর্কেও কিন্তু এ কথাটা প্রযোজ্য। D.N.A. সৃষ্টিও যে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় সম্ভব তা D.N.A.-এর অপরিহার্য পদার্থ Adenine ইত্যাদির আদিম অবস্থায় রসায়নাগারে উৎপাত্ততেই জানা গেছে। D.N.A.-এর আকৃতি বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, প্রতিটি D.N.A. আসলে spiral stair case-এর মতো গঠিত, অনেকটা দুটো তার বা শৃঙ্খল পরস্পর জড়াজড়ি করে aniled অবস্থায় থাকলে যে রকম হয়। প্রোটিনের আকৃতি বা গঠন যা বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন, তার কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডের আকৃতি বা গঠনের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। যে আবিষ্কার বিজ্ঞানীকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে তুলেছে তা হলো কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস যখন বিভক্ত হয় তখন প্রতিটি D.N.A.-এর self-duplication শুরু হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এক একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের অনু দুটি শৃঙ্খল বা চেনের পরস্পরের জড়াজড়ির মাধ্যমে একটা spiral stair case-এর মতো সৃষ্টি করেছে। ফসফেট ও শর্করায় প্রস্তুত দুটো চেন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে adenine, guanine ইত্যাদি নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষার জাতীয় পদার্থের অনুর মাধ্যমে। কোনও একটি নিউক্লিক অ্যাসিড সদৃশ পদার্থ সৃষ্টির (self-duplication) কালে প্রথমে ক্ষার জাতীয় পদার্থের অণুগুলোর পরস্পরের বুনন খুলে যায় এবং তার ফলে শৃঙ্খল দুটো পৃথক হয়ে পড়ে। এখন প্রোটিন এনজাইমের প্রভাবে প্রাতটি শৃঙ্খল cell fluid থেকে শর্করা, ফসফেট, নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষার জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো জড়ো করে ক্ষার জাতীয় পদার্থের অনুযুক্ত অপর একটি শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে। পূর্বতম শৃঙ্খল ও নতুন সৃষ্ট শৃঙ্খলটির ক্ষার জাতীয় পদার্থের অনুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল দুটোর পরস্পরের জড়াজড়ির মাধ্যমে নতুন spiral stair case প্রস্তুত করে। এভাবে একটি নিউক্লিক অ্যাসিড অনুর প্রতিটি শৃঙ্খল এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিউক্লিক অ্যাসিড অনু সৃষ্টি করে এবং এভাবে প্রথমে একটি নিউক্লিক অ্যাসিড অনু দুটো সদৃশ অনুর সৃষ্টি করে আর প্রক্রিয়াটি কিছুক্ষণ চললে বহু নিউক্লিক অ্যাসিড অনুর উৎপত্তি ঘটে।

এ ছাড়া নিউক্লিক অ্যাসিডের অপর একটি অপরিহার্য কার্য হলো অ্যামিনো অ্যাসিড জড়ো করে জীবদেহে প্রোটিন সংশ্লেষণ করা। এ ব্যাপারে আর একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল, রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribo Nucllic acid) বা সংক্ষেপে R.N.A.। প্রধানত জীবকোষের 'সাইটোপ্লাজম' অংশেই R.N.A. পাওয়া যায়। প্রোটিন ও বিভিন্ন প্রোটিন জাতীয় এনজাইম সংশ্লেষের ক্ষেত্রে এ দুই নিউক্লিক অ্যাসিডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। আবার D.N.A. মুলত কোনও species-এর বংশ পরস্পরায় দৈহিক আকৃতি, প্রকৃতি অন্যান্য সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যের বার্তাবহ হলেও যদি কোনও জীবকোষে D.N.A.-এ স্থলে শুধুমাত্র R.N.A. থাকে, তাহলে সে কাজ তার উপরে বর্তায়। আবার D.N.A. যখন মূলতঃ উপরোক্ত genetic information বহন করে চলে কোষ থেকে নতুন কোষে তখন এক বিশেষ ধরনের R.N.A. genetic information অনুযায়ী species-এর বৈশিষ্ট্যাদির ছাপ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবকোষ গঠনে যে যে ধরনের প্রোটিনের প্রয়োজন, আশে-পাশে প্রচুর

অ্যামিনো অ্যাসিড জড়ো করে সে ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। নিউক্লিক অ্যাসিডের self replicate করার ক্ষমতাটা কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।

বিভিন্ন ভাইরাসকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ভাইরাস প্রধানত প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। সে কারণে এদের নিউক্লিক প্রোটিন বলা যেতে পারে। নিউক্লিক অ্যাসিড, R.N.A. বা D.N.A. হতে পারে। সবচেয়ে সরল ভাইরাস হলো Tobacco Mosaic Virus, যার দেহে আছে মাত্র একটি R.N.A. আর তাকে ঘিরে আচ্ছাদনের আকারে রয়েছে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন। এই ভাইরাসও যে self duplicating হয়ে ওঠে জীবদেহে ঢোকার পর তা আমরা দেখেছি। জীবদেহে প্রবেশ করার পর ভাইরাসের প্রোটিন আচ্ছাদনটি খুলে যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দুটি self duplicating-এর মাধ্যমে প্রচুর ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে, আর এই অনুগুলো আবার প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন সৃষ্টি করে নেয় জীবদেহ থেকে আর সে প্রোটিনকে আচ্ছাদনে পরিণত করে একাধিক ভাইরাসের জন্ম দিতে থাকে। এইভাবেই চলে ভাইরাসের self replication। এখন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফৎ এ সত্যে উপনীত হওয়া গেছে যে, কোনও নিউক্লিক অ্যাসিড একমাত্র প্রোটিনের সংস্পর্শেই বা protein nucleic acid combination self replicating হয়ে উঠতে পারে। যেমন ভাইরাস D.N.A. বা R.N.A. self replicating তখনই হবে যখন cell-এ থাকবে প্রোটিনের সংস্পর্শ। জীবকোষে উপযুক্ত প্রোটিন এনজাইমের (জৈব প্রভাবক বা অনুঘটক) প্রভাবেই যে self replication সম্ভব তা আমরা পূবেই দেখেছি। সুতরাং এই প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড সংমিশ্রণই যে উন্নততর পরিবর্তনের চাপে জীববস্তুর জন্ম দিয়েছে তা আজ পরীক্ষিত সত্য বললেও বিন্দুমাত্র সত্যের বিকৃতি ঘটবে না।

বিজ্ঞানীকে জীবন সৃষ্টির প্রথম ধাপে এই প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিডের এক বিশেষ ধরনের সংমিশ্রণে পৌঁছতে হবে। এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার কথা মনে করা যেতে পারে। বিজ্ঞানী Tobacco Mosaic Virus-এর নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটন অংশ প্রথমে পৃথক করেন, অতঃপর তাদের সংমিশ্রণে যে পদার্থটি সৃষ্টি হলো তার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেতে দেখলেন অর্থাৎ বস্তুটি self replicating হয়ে উঠলো।

সুতরাং প্রোটন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণের পর বিশেষ বিশেষ অনুঘটকের উপস্থিতিতে এই দুই পদার্থের বিশেষ প্রকার সংযোজকের মাধ্যমেই এগোতে হবে বিজ্ঞানীকে পরীক্ষাগারে জীবন সৃষ্টি করতে হলে। উপযুক্ত পদার্থ দুটির সংশ্লেষণেই বিজ্ঞানী বহুদূর এগিয়েছে।

Protein কিংবা নিউক্লিক অ্যাসিড জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন পদার্থটির প্রাথমিক অবদান তুলনামুলকভাবে বেশি এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতরে মত পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য এ মত পার্থক্যের সঙ্গে জীবনের বস্তুবাদী ভিত্তির চিন্তাধারার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কোনও বিরোধিতা নেই সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না।

প্রথম পক্ষ যারা protein অনুর ওপর জীবন সৃষ্টির ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন, তাদের মত অনুযায়ী আদিম protein অনুর self replication প্রক্রিয়া জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাবকের কাজ করেছে। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুগুলোর পারস্পরিক মিলনের ফলে যে পলিপেপটাইড অনু সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের ভিতরে কোন না কোন পদার্থ নিউক্লিওটাইড অনুগুলোর সমন্বয় প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে প্রভাবক হিসেবে, আর তার ফলেই গড়ে ওঠে পলিনিউক্লিওটাইড ও তৎপরে নিউক্লিক অ্যাসিড।

অপর মত অনুযায়ী, primitive ocean-এ সূর্যের কিরণ অতিবেগুনী রশ্মি, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি নানা প্রকারের নৈসর্গিক শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন জৈব পদার্থের পারস্পরিক মিলন তথা গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নিউক্লিওটাইড অনুগুণির কোনও protein প্রভাবকের সাহায্য ব্যতিরেকেই পলিনিউক্লিওটাইডে পরিণত হতে পারে। এ তত্ত্বের সমর্থনে ইদানিংকালের গবেষণাগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে একাধিক নিউক্লিওটাইড অনুর পারস্পরিক সংযোজনের মাধ্যমে protein প্রভাবক ব্যতিরেকেই পলিনিউক্লিওটাইড সংশ্লেষণে সমর্থ হয়েছেন।

এখন এই নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রভাবে পলিনিউক্লিওটাইডের polymerisation প্রক্রিয়ায় প্রভাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের একই প্রক্রিয়া যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া চলাকালীন এমন দু একটি পদার্থের সৃষ্টি হলো যারা এই প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, প্রক্রিয়াকে একদিকে দ্রুত করে তুলল অপর দিকে বিশেষ বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযোজনে বিশেষ বিশেষ পলিপেপটাইড অনু সৃষ্টি করতে সাহায্য করল এবং তার সঙ্গে জীবন সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য প্রোটিন অনুর সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠলো।

এই প্রক্রিয়ার শুরুকেই এক অর্থে জীবন সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অপর দিকে কোনও কোনও

primitive নিউক্লিক অ্যাসিডের কোনও বিশেষ ধরনের নিউক্লিওটাইড অংশগুলো এমন এক ধরনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে যার ফলে জীবন সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপাদনের কাজকে ত্বরান্বিত করে তুললো।

জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার অবদান বেশি বা কার সৃষ্টি প্রথম হয়েছে, প্রোটিন না নিউক্লিক অ্যাসিড অনুর তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ থাকলেও, এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ই জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। এবং নিউক্লিক অ্যাসিডে self replication যে ঘটে তা যে প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিডের সমন্বয়ের দ্বারাই ঘটা সম্ভব তা আমরা পুর্বেই আলোচনা করেছি। এ জাতীয় self replication-এর সঙ্গে living organism-এর self replication-এর মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানসম্মত যে নিউক্লিক প্রোটিন বা প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়েই সর্বপ্রথম self replication দেখা দিল যার আরও উন্নততর প্রকাশ ঘটলো living organism-এর ক্ষেত্রে। সুতরাং এই সমন্বয়ের স্তরটির মাধ্যমেই যে ভবিষ্যতে জীবন সৃষ্টির বীজ নিহিত ছিল তা স্বীকার করতেই হবে।

এতক্ষণ যেটা আলোচিত হলো তা হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সংমিশ্রণে যে জীবন সৃষ্টি ঘটেছে তার bio chemical aspect। সমস্যাটির bio physical aspects-ও চিন্তা করার দরকার আছে। প্রয়োজন রয়েছে এটা বোঝার যে, প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড সংমিশ্রণের physical state-এরও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে, কারণ জীবন্ত protoplasm যা নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাসমের সংমিশ্রণে তৈরি তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, বস্তুটি “colloidal state” -এ রয়েছে।

প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড তথা অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে কিভাবে primitive ocean-এ অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদাভাবে এই বিশেষ ধরনের সংগঠন যা আদিম জীবন্ত বস্তুগুলির ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য ভূমিকা নিয়েছে সেটা গড়ে উঠল তা আলোচনা সাপেক্ষ। এ ব্যাপারে পরীক্ষাগারে রুশ বিজ্ঞানী ওপারিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফৎ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে অনেকটা এরকম, এটা পরীক্ষালব্ধ সত্য যে কলয়ডিয় দ্রবণে বিশেষ অবস্থায় দ্রবীভূত পদার্থগুলো তলায় থিতিয়ে পড়ার পরিবর্তে coa cervate নামক cluster তৈরি করতে পারে। যদিও এজাতীয় cluster-গুলো বিপরীতধর্মী তড়িৎযুক্ত হয়, তা সত্ত্বেও তাদের পরস্পর মিলন মাধ্যমে থিতিয়ে পড়া সম্ভব হয় না এ কারণে যে, প্রতিটির চারপাশে জলের পর্দা থাকে। এখন এই জলের পর্দার ভিতর দিয়ে অন্যান্য পদার্থের অনুগুলো coa cervate-এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবং বেরিয়েও আসতে পারে। এভাবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করে coa cervate-এ absorbed হতে পারে আবার তেমনি কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে আসতেও পারে। এখন সেই primitive ocean বা Haldens hot thin soup-কে মোটামুটি ভাবে কলয়ডিয় দ্রবণ মনে করাটা অবৈজ্ঞানিক হবে না। বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে যে এভাবে কলয়ডিয় দ্রবণ করতে পারে তা আমাদের জানা আছে। দুধ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখন এই কলয়ড দ্রবণে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড জাতীয় পদার্থগুলোর একটি সংমিশ্রণ ক্রমশঃ উপযুক্ত coa cervate ক্লাসটার-এ রূপান্তরিত হতে পারে। এই coa cervate-গুলো রয়েছে আরও বহু জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত primitive ocean-এ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এসকল পদার্থের সহিত cluster-গুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে, শুরু হবে দেওয়া-নেওয়া (give and take) প্রক্রিয়া, তার ফলে cluster-গুলোর ভেতরে সংশ্লেষণ (synthesis) ও বিভাজন (disintegration)-এ দুই বিপরীত শক্তির (unity of opposites) সৃষ্টি হবে। জৈব দেহ তথা দেহের বিভিন্ন অংশে tissue থেকে শুরু করে cell তথা প্রোটোপ্লাসম অবধিই সব সময় এ ধরনের বিপরীত প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। একদিকে dying out অপর দিকে reformation সারা জীবনব্যাপী জীবদেহে এ প্রক্রিয়া চলে। বস্তুজগতে বস্তুর ক্রমবিবর্তন ধারায় এই unity of opposites-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে একথাটা এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। এবং coa cervate-এর সৃষ্টি ও তার ক্রমপরিবর্তনেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এখন এ প্রক্রিয়া চলাকালীন একদিকে যেমন কিছু কিছু coa cervate চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে অপর দিকে কিছু কিছু cluster আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কালক্রমে এ সকল coa cervate-এ যে সকল পদার্থ enzyme বা প্রভাবক নামে খ্যাত, জীববস্তুর বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় যা অপরিহার্য্য সেগুলোর সৃষ্টি ঘটবে। এ ধরনের coa cervateগুলো, যেগুলো মূলতঃ প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে, ক্রমশঃ পরিবর্তনের ধাপে এগোতে এগোতে গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কালক্রমে প্রোটোপ্লাসমের জন্ম দিয়েছে। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, coa cervate থেকে প্রোটোপ্লাসমে উত্তরণ সময়ের মাপকাঠিতে নিশ্চয়ই একটা বিরাট যুগ এবং বহু coa

৮৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভারতীয় সমাজে শ্রেণি বিভাজন তথা শ্রেণি সংগ্রামের সূচনা বিন্দু

তরুণকান্তি নস্কর

মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তবাদের তত্ত্বকে ভিত্তি করে মানব সমাজের বিকাশের স্তরগুলো সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজে শ্রেণি বিভাজন ও শ্রেণি সংগ্রাম, দাস-দাসমালিক ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব এবং তার ধারাবাহিকতায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আরও উত্তরণের পথে সাম্যবাদী সমাজ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমরা করতে পারি। ভারতে সমাজ ক্রমবিবর্তনের এই ধারাটি কেমন ছিল- যাঁরা এদেশে বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত- তাঁদের গভীরভাবে চর্চা করতে হয়। ভারতীয় সমাজে শ্রেণি বিভাজন তথা শ্রেণি সংগ্রামের সূচনা কবে হয়েছিল সে নিয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে বহু বিতর্ক আছে। বর্তমানে যখন রাজনৈতিকপ্রয়োজনে ইতিহাস পুনর্লিখনের একটি পরিকল্পিত চেষ্টা কাজ করছে তখন এই বিতর্ক সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পেয়েছে। বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য বিষয় ইতিহাসের বিতর্কিত সেই অধ্যায়।

প্রবন্ধটিতে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের পুস্তক থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম গবেষণা পত্রিকাগুলির সন্ধান করার চেষ্টা হয়েছে। এমন নানা বিষয় উপস্থাপনার ফলে আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি অ্যাকাডেমিক রচনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি বিশেষ করে ভারতে শ্রেণি সমাজ গড়ে ওঠার সূচনা পর্বটি বুঝতে এই প্রবন্ধ সাহায্য করবে বলে মনে হয়েছে।

* * *

মার্ক্সের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম পরিচ্ছেদ যে বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে তা হল, “The history of all hitherto existing society is the history of class struggle.” অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালে। পরবর্তীকালে বইটির অনেক সংস্করণ বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালের প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলস উক্ত বাক্যটির জন্য যে পাদটীকা লিখেছিলেন তাতে বলা ছিল, নথিভুক্ত ইতিহাসের পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক সমাজ এবং তার সামাজিক সংগঠনগুলি ১৮৪৭ সালে সম্পূর্ণ অজানা ছিল।[১] এরপর ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ (১৮৫৯) মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে দর্শন হিসাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। মার্ক্স ডারউইন তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘It removed supernatural from natural sciences’. পরবর্তীতে বিশেষ করে মর্গানের ‘আমেরিকার নেটিভ ট্রাইব’ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সামনে আসে। আরও কিছু আবিষ্কারের সঙ্গে এই তত্ত্বের উল্লেখ করে এঙ্গেলস ওই পাদটীকায় আদিম সাম্যবাদী সমাজের অস্তিত্বের কথা বলেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রথম প্রকাশের পরের আবিষ্কারগুলি প্রমাণ করেছিল যে ‘শ্রেণি সংগ্রাম’-র ইতিহাসের আগেও একটি সমাজ ছিল যেখানে শ্রেণি সংগ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। যাকে ‘আদিম সাম্যবাদী’ ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করা হয়।

এখানে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সেই যুগের ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা হবে যখন আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা ছিল এবং তার ধারাবাহিকতায় মার্ক্স আবিষ্কৃত দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মে শ্রেণি বিভাজনের সূচনা হয়েছিল। যদিও স্বীকার করতে হবে যে বিষয়টি এখনও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। এখন প্রাগৈতিহাস কী ? তা হল ইতিহাসের আগের সময়, যখন লেখালিখি শুরু হয়নি অর্থাৎ যার কোনো লিখিত দলিল নেই। লেখালিখি শুরু হলেই তবে ইতিহাসের সূচনা হয়। তাতে বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তি নিজেদের নামে অথবা শনাক্তযোগ্য কোনো কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে সজীব হয়ে ওঠে। আবার ইতিহাসের উপাদানের লিখিত রূপ থাকা সত্ত্বেও তা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ার ফলে এমন নিদর্শনও আছে যা এখনও আমাদের সামনে পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়নি। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো বা সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এই সভ্যতায় অনেক সীল পাওয়া গেছে যেগুলিতে কিছু কিছু লেখা আছে যাদের পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসকেই এখানে আলোচ্য বিষয় করা হয়েছে।

ইতিহাস নির্মাণের উপাদান

ইতিহাস নির্মাণের উপাদান সম্পর্কে একটু উল্লেখ প্রয়োজন। উপাদানগুলির অন্যতম হল জীবাশ্ম, প্রাচীন মানবদের বসতি যেখানে যেখানে ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং মানুষের তৈরি বিভিন্ন বস্তু ও সরঞ্জাম। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও কার্বণ ডেটিং পদ্ধতির মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করে ইতিহাস নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ইতিহাসবিদদের মতে, যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোনো সমাজের স্বল্পাংশই সংরক্ষণ করতে পারে, তাই এর দ্বারা প্রাচীন সমাজের যথাযথ পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। আবার লিপির উদ্ভব ও সাথে সাথে লিখতে শেখার পর যে সাহিত্য রচনা হয়েছিল তা থেকে সমাজচিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটা গুরুতর সমস্যা হল, সেই সময় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ যেহেতু সমাজের উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ওই সাহিত্য থেকে সমাজের খণ্ডিত ছবিই ধরা পড়ে। যাই হোক, আগেই উল্লেখ হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার লিপি উদ্ধার হয়নি। তাই সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল প্রাগৈতিহাসের মধ্যে ফেলার চল আছে। যদিও সমসাময়িক কালের পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয় বা মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কিছু নিদর্শনে হরপ্পা সভ্যতার উল্লেখ থাকায় তা কিছুটা ইতিহাস হয়ে উঠেছে। এই ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসের অন্তবর্তী সময়কে অনেক ইতিহাসবিদ 'প্রায়-ইতিহাস' (Proto-history) হিসাবে বর্ণনা করেন। সিন্ধু সভ্যতা এমন প্রায়-ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত।

যাই হোক, ইতিহাস নির্মাণের পদ্ধতি এখন আর কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা সাহিত্যের উপর নির্ভর করে নেই। যেহেতু সমাজের ইতিহাস মানুষকে নিয়ে, তাই প্রাচীন ও বর্তমান উভয় সময়ের মানুষের ডিএনএ বিশ্লেষণই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। হাজার, লাখো বছর আগে বসবাসকারী মানুষের জীবাশ্ম থেকে সংগৃহীত ডিএনএ বিশ্লেষণ করে প্রাগৈতিহাসকে জানার পদ্ধতি চালু হয়েছে। জিন গবেষকরা প্রাচীন জীবাশ্ম থেকে সফলভাবে ডিএনএ নিষ্কাশন করে ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করছেন। এই ডিএনএ পদ্ধতি কত সহায়ক হয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে "Early Indians" পুস্তকে টনি যোসেফ লিখছেন, ''ছয় বছর আগে আমরা জানতাম না ৬৫০০০ বছর আগে ভারতে পৌঁছানো আদিতম 'আফ্রিকা বহির্ভুত' অভিবাসীদের কাছে আমরা বা আমাদের পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমিকভাবে কতটা ঋণী, কিন্তু এখন আমরা তা জানি''।[২] তিনি আরও বলছেন, ''প্রযুক্তি যদি আজকের এই স্তরে উন্নীত না হত, তাহলে বিজ্ঞানীদের পক্ষে এমন সব আবিষ্কার সম্ভবপর ছিল না। আর যদি তাঁদের এই আবিষ্কারগুলো অধরা থাকত, তাহলে আমাদের প্রাগৈতিহাস আগের মতোই অনির্দিষ্ট ও বিতর্কিত রয়ে যেত...''।[২]

প্রথম ভারতীয় কারা

শুরুতে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি প্রথম বা মূল ভারতীয় বলতে আমরা কাদের বুঝব। কোথা থেকে তাঁরা এসেছিলেন? তাঁদের কি একটিই পূর্বপুরুষ? না, তারা বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে এসেছিল? এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন তাহল- আধুনিক মানুষের প্রথম উদ্ভব আফ্রিকায় এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ ও জিন বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে প্রাগৈতিহাসিক ভারতে আধুনিক মানুষের পরিযানের (migration) কালানুক্রমিক সূচি তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আরও নয়া আবিষ্কারে এই সূচী পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভবনা যে থাকবে এটা ধরে নেওয়া অমূলক হবে না। এখানে আদি ভারতীয় বলতে কেবল আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো সেপিয়ান্সদের বোঝানো হয়েছে, যদিও হোমো প্রজাতির অন্যরাও ভারতে ছিলেন যাঁরা একটি পর্যায়ে অবলুপ্ত হয়েছেন। কালানুক্রমিক সূচিটি নিম্নরূপ। Tony Joseph, Early Indians[২] পুস্তকের সাহায্যে এই সূচিটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

১) হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম ফসিলের বয়স ৩, ০০,০০০ বছর যা আফ্রিকা মহাদেশের মরোক্কোর সাফি শহরের থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের এক গুহায় ২০১৭ সালের জুন মাসে পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের আগে ইথিওপিয়ায় প্রাপ্ত ২, ৩৩,০০০ - ১, ৯৬, ০০০ বছরের পুরানো দুটি মাথার খুলিই ছিল প্রাচীনতম আধুনিক মানুষের জীবাশ্ম। অর্থাৎ মরোক্কোর আবিষ্কার হোমো সেপিয়ান্সের বয়স অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

২) আফ্রিকার বাইরে প্রাপ্ত আধুনিক মানুষের জীবাশ্মের বয়স ১, ৭৭,০০০ - ১, ৯৪,০০০ বছর যা উত্তর ইজরায়েলের এক পাহাড়ের গায়ে পাওয়া গিয়েছে।

৩) প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে আফ্রিকা বহির্মুখী পরিযান লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বাব-এল-মান্দের হয়ে (আধুনিক ইয়েমেন) দিয়ে এশিয়ায় ঘটেছিল। আজকের অনাফ্রিকীয় জনসংখ্যার এঁরা সকলেই পূর্বসূরি। একথা বলার কারণ, এর আগের আফ্রিকার বাইরে যাওয়া হোমো প্রজাতির সদস্যরা এমন কোনো বংশ চিহ্ন রেখে যেতে পারেননি যা বর্তমান প্রযুক্তি দ্বারা শনাক্ত করা যায়।

৪) প্রায় ৬৫,০০০ বছর আগে আধুনিক মানুষের এই পরিযায়ীরা ভারতে প্রবেশ করেন এবং বিপুল সংখ্যক অন্য হোমো প্রজাতির মানুষের সম্মুখীন হন। আসলে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে হোমো স্যাপিয়েন্স ছাড়া হোমো প্রজাতির অন্যান্যরা তখন আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। প্রাপ্ত পাথরের তৈরি অস্ত্র থেকে এই অনুমান করা যায়। এই প্রজাতিরা হোমো ইরেক্টাস, হোমো হাইডেলবার্গেনিন্স, হোমো লিয়েন্ডারথালেনিন্স বা অন্য কোনো, তা সঠিকভাবে এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। যদিও শেষোক্ত এই হোমো প্রজাতিরা ৩৫,০০০ বছর আগেই অবলুপ্ত হয়েছেন।

৫) ৪৫,০০০-২০,০০০ বছর আগে তারা অতিক্ষুদ্র পাথরের তৈরি যন্ত্রাদির ব্যবহার শুরু করেন।

৬) ৭০০০-৫৫০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের মেহেরগড়ে এক নতুন কৃষিজাত উপনিবেশের পত্তন হয় যা ক্রমেই সিন্ধু ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অংশে ওই সময়ের বৃহত্তম জনবসতিগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে।

৭) ৭০০০-২৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যব ও গম চাষ এবং তার সাথে পোষ মানানো গবাদি পশুর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের প্রমাণ আছে এবং তা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, সিন্ধু, ঘাগগর, হাকরা নদীর উপত্যকায় ও গুজরাতের কচ্ছ, ধোলাভিরা পর্যন্ত ছিল তার বিস্তার।

৮) ৫৫০০-২৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কালিবঙ্গান, রাখিগড়ি এবং পাকিস্তানের বনওয়ালি ও রহমান ঢেরিতে একটু একটু করে তাদের একান্ত নিজস্ব শৈলীতে প্রাথমিক কৃষিজাত উপনিবেশগুলো গড়ে উঠেছিল। এটাই ছিল হরপ্পা যুগের আদিভাগ।

৯) ২৬০০-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ যা পরিণত হরপ্পা যুগ বলা হয়। এই সময় একই ধরনের / নির্দিষ্ট লিপি, শিলমোহর, চিহ্ন তথা পরিমাপক বাটখারার প্রচলন দেখা গেল। এগুলি সারা অঞ্চলের উন্নততর মান নির্ধারণ করে। আদি হরপ্পা যুগ থেকে পরিণত হরপ্পা যুগের রূপান্তর ঘটে ৪-৫ প্রজন্মের বা ১০০-১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে।

১০) ২০০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে একটি নতুন পরিযানের ঢেউ ওঠে। মধ্য এশিয়ার স্তেপভূমি থেকে পশুপালক গোষ্ঠী দক্ষিণ এশিয়ার দিকে আসে এবং ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও তার সাথে এক নতুন জীবন শৈলীর উদ্ভব ঘটে।

১১) ১৯০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দেই হরপ্পাযুগের অন্তিম ভাগ। ক্রমে এই সভ্যতার ক্ষয় ও ঘটনাচক্রে অবলুপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত তালিকাটি ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক মানুষের পরিযান সম্পর্কে একটি ধারণা দেবে। ওই তালিকায় ৫ নং পর্বটি আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বটি ভেঙে ও প্রসারিত করে বললে দাঁড়ায়, পুরানো প্রস্তর যুগ (১০,০০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত), মধ্য প্রস্তর যুগ (৮,০০০ - ৪, ০০০ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং নব্য প্রস্তর যুগ (৭০০০ - ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব)। উল্লেখ্য, সাধারণভাবে ২,৫০০,০০০ - ১০,০০০ বছর আগে পুরানো প্রস্তর যুগ ধরা হয়। [আসলে পুরানো, মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগগুলির মধ্যে নির্দ্দিষ্টভাবে সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না এবং তা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন] যাই হোক, এই সব বিভিন্ন পর্ব অতিবাহিত করতে করতে খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ বছর নাগাদ (অর্থাৎ প্লাইস্টোসিন বা তুষার যুগ সমাপ্ত হওয়ার শেষে) খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে কৃষিকর্ম ও পশুপালনের যুগে উন্নীত হয়। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই জাতীয় অর্থনৈতিক রূপান্তর শুরু হয়েছিল- পশ্চিম এশিয়ায় মিশরের উত্তরাংশ থেকে মেসোপটেমিয়া এবং আফগানিস্থান থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত সিন্ধু সংস্কৃতির সূত্রপাত এই সময় ঘটে। ‘‘এই সিন্ধু সংস্কৃতিকে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, কারণ সিন্ধু সভ্যতা এই অভিধা সাধারণত: নগরায়ণ ও সংহতির যুগকে বোঝানো হয়’’[৩] যা পরে উল্লেখ করা হবে। অর্থাৎ ‘‘সিন্ধু ঐতিহ্যের সূচনা কালের শিকড় গাঁথা আছে প্রায় ২০,০০০ বছর আগে পুরানো প্রস্তর যুগের একটি পর্বে’’[৩] গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর সাম্প্রতিক গবেষণায় এই বিষয়টি আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধীনগর ও কানপুর আইআইটির গবেষকরা এই কাজ করেছেন এবং The Deccan Herald সংবাদপত্রে গত ৫ জুন ২০২৫ তা প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক, খাদ্য সংগ্রহের এবং গ্রাসাচ্ছাদনের বিবিধ কৌশল আয়ত্ত করে সে যুগের মানুষ ক্রমান্বয়ে কৃষিকর্ম, পশুপালন, অন্যান্য প্রযুক্তিগত কৌশলকে একত্রিত করে ও তার বিকাশ ঘটাতে ঘটাতে সিন্ধু সভ্যতার জন্ম দেয়।

পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে কৃষিকর্ম ও পশুপালনের যুগে উত্তরণ

২০,০০০ বছর পূর্বে পুরাতন প্রস্তর যুগ পর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে পাকিস্তানের সোআন নদীর তীর বরাবর ও মাদ্রাজে। ওই সময় সমাজ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে

শিকার এবং বনজ ও খাল-বিল-নদী-সমুদ্র জাত খাদ্যদ্রব্যের লভ্যতার উপর নির্ভর করত তাদের সাময়িক ডেরার আয়ুষ্কাল। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য ঘটলে মানব গোষ্ঠীদের স্থান পরিবর্তন করতে হত। স্বাভাবিকভাবে শিকার ও সংগ্রহের মাধ্যমে উপলব্ধ খাদ্য সামগ্রী তখনই খেয়ে না নিলে তা পচে যেতো, সংরক্ষণের কোনো বিষয় ছিল না। ফলে একজন অপরকে বঞ্চিত করে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করবে তার সম্ভবনা ছিল না। খাদ্যের জন্য হয়ত নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, একজন হয়ত বেশি খাবার পেয়ে যেতো, অন্যজন কম। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পত্তিজাত কৌলিন্যের কোনো পার্থক্য ছিল না। উচ্চ ও নিম্ন বর্গের তারতম্য ছিল না।

খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হলে ডেরার স্থান পরিবর্তন করতে হত- কৃষিকাজ ও পশুপালনে হাত পাকানো শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এমনই শিকার ও সংগ্রহকারী যাযাবরের জীবন ছিল তাদের। কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি তখন সৃষ্টি হয়নি। শিকার করা মাংস বা সংগৃহীত খাদ্য থেকে শুরু করে গোষ্ঠীর যাবতীয় সম্পত্তি গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সম্পদ হিসাবে ভাবার অভ্যাস ছিল। সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। এক গোষ্ঠীর সংগে আর এক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। সেই দ্বন্দ্ব বা লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সেনাপতি হয়ত কাউকে নিযুক্ত করা হত এবং তার পরিচালনায় লড়াইয়ে সক্ষম গোষ্ঠী-সদস্যরা অংশ নিত। আজকের মতো আলাদা সেনাবাহিনী ছিল না এবং সেনাপতিরও আলাদা কোনো পদমর্যাদা বা সুযোগ-সুবিধা ভোগের প্রশ্ন ছিল না , যেমন করে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা দেখি। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা আরও বিশেষ করে বললে শ্রেণি বিভাজন ভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্ম তখন হয়নি। ঐতিহাসিক কারণেই তার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

মধ্যপ্রস্তর যুগ- ভারতে মধ্যপ্রস্তর যুগ এবং নবপ্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া যায় গুজরাটের লাঙ্ঘনাজ বসতি এলাকায়। মধ্যপ্রস্তর যুগের দুটি পর্যায়- প্রথম পর্যায়ে পশুশিকার ও মাছধরা, দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষিকাজ ও পশুপালন প্রথা শুরু হয়। গৃহে পশুপালন ও কৃষিকাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই প্রথা শুরুর মধ্যদিয়ে মধ্যপ্রস্তর যুগের অবসানের সূচনা হয়। '৪,০০০ খ্রীষ্টপূর্বের শুরুতে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় বসতিগুলির অধিবাসীরা যখন পশুশিকার আর মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত ছিল তখন উত্তরে সিন্ধুদেশে স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল'।[৫] এগুলি ছিল নবপ্রস্তরযুগ সূচনার ইঙ্গিতবাহী।

নবপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তর যুগের গোড়ার দিক, 'মোটামুটি ৩৮০০-৩২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধু উপত্যকায় কয়েকটি প্রধান নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা যায়। এগুলি হলো উত্তর-পূর্ব বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কিলি গুল মহম্মদ (বর্তমান পাকিস্তানের কোয়েটা উপত্যকায়) ইত্যাদি। এসময় কৃষিকাজ ও পশুপালন আরও উন্নত হয়ে ওঠে, মানুষ যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বসবাসের দিকে ঝোঁকে। গাড়ি-টানা পশু হিসাবে ষাঁড়কে কাজে লাগানো হয় (নিবীর্যকরণের ফলেই কেবলমাত্র তা সম্ভব)। হরপ্পার প্রাক-সিন্ধু স্তরে গোরুর গাড়ির চাকার দাগ পাওয়া যায়। ষাঁড়কে গাড়ি টানার কাজে ব্যবহারের পর লাঙ্গল টানার কাজে ব্যবহার হয়। উত্তর-রাজস্থানের কালিবঙ্গানে হলচিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। আগে নিড়ানি দিয়ে বা মাটি কুপিয়ে কায়িক শ্রমে যে চাষ হত, লাঙ্গলের আবিষ্কারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেল। ফলে জনসমষ্টির মাথা পিছু উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বর্দ্ধিত হোল। কৃষিজাত ফসল হিসাবে পাওয়া গেল, কোয়েতার মেহেরগড়ে বার্লি ও গম (রবি চাষ), পাঞ্জাবের রোহিরায় ভুট্টা ও জোয়ার (গ্রীষ্মের চাষ), বালাকোট ও রোহিরায় খেঁজুর ও আঙুর। কালিবাঙ্গানে তন্দুর রুটি বানানোর চুল্লি পাওয়া যায়'।[৪] অর্থাৎ স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষণগুলি ক্রমাগত স্পষ্ট হয়। এগুলি সিন্ধু উপত্যকার আসন্ন নগর-সভ্যতার আভাস দিচ্ছিল। এই কালপর্বটি প্রাচীন সিন্ধু সংস্কৃতির যুগ। পরিণত সিন্ধু সভ্যতার যুগের শুরু তার পরবর্তীকালে অর্থাৎ ২৬০০-২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব। ইরফান হাবিবের মতে- ''প্রাচীন এবং পরিণত সিন্ধু সময়কালের মধ্যে অসংখ্য সমাপতন এবং তা নিয়ে বিতর্ক রয়েই যায়। কাজেই কার্বন-তারিখগুলি যেখানে কমবেশি ঘনসন্নিবিষ্ট সেটিকেই সিন্ধু সভ্যতার যুগ হিসাবে মেনে নেওয়াই সবচেয়ে ভালো সমাধান। সেই সময়কালটা গড়পড়তা ২৫০০-২০০০ খ্রীষ্টপূর্ব। ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বের আগের শতাব্দীকে আমরা 'যুগপরিবর্তন' কাল হিসাবে মেনে নিতে পারি। এ এমন একটা সময়কাল যখন সভ্যতা তার মূল কেন্দ্র থেকে অন্য সব অংশে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল''।[৪] অর্থাৎ প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার গর্ভেই পরিণত সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতেই প্রাপ্ত নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে কালের পার্থক্য নির্ণয় করে ইতিহাসবিদরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কিভাবে আদিম মানুষের যাযাবর অবস্থা থেকে স্থায়ী বসবাসের দিকে উত্তরণ ঘটছে, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার অগ্রগতিতে সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হচ্ছে।

স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হলে তার মালিকানার প্রশ্ন আসে। প্রাচীন সিন্ধুযুগ থেকে শুরু করে পরিণত সিন্ধুযুগে প্রচুর সীলমোহর পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা সীলের প্রাচুর্যকে মালিকানার ইঙ্গিতবাহী হিসাবে গণ্য করেছেন। সীল সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডি এইচ গর্ডন বলছেন, "The Harappan seals are quite the most enigmatic of the objects found. In spite of their large numbers they must have had a restricted use– and it follows that if they had the function of identification– they must have been restricted to certain classes of individuals such as officials and merchants."[৮] অর্থাৎ ‘‘উপলব্ধ বস্তুগুলির মধ্যে হরপ্পা সীলগুলি বেশ রহস্যময়। তাদের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও, তাদের ব্যবহার নিশ্চয়ই সীমিত ছিল এবং এর অর্থ হল, যদি এই সীলগুলি [মালিক] সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার হয়, তাহলে বুঝতে হবে এগুলির ব্যবহার অবশ্যই নির্দিষ্ট শ্রেণির ব্যক্তি যেমন কার্যকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল’’।[৮]

সীলের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব বলেছেন, ‘‘এতে বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এমন সর্বত্রস্তরে বিস্তৃত হয়েছিল যাতে প্রতিটি ধনী ব্যক্তির নিজের সম্পত্তিতে সীলের চিহ্ন অঙ্কিত করার প্রয়োজন হোত। সীলের ছাপ লাগানো মাটির পেয়ালা পাওয়া গেছে। আর লোথালের পণ্য-গুদামের কাদামাটির সীলফলক থেকে জানা যায় কীভাবে পণ্যপূর্ণ বয়ামগুলি মালিকের নিজস্ব চিহ্ন বহন করতো।... আমাদের জ্ঞাত সীলের ৬৮ শতাংশ এসেছে মহেঞ্জোদড়ো থেকে আর হরপ্পা থেকে ১৯ শতাংশ। এই তথ্যটি তার আপন বৃত্তান্তে একটি ইঙ্গিত বহন করে। যেসব অস্থাবর সম্পত্তির ওপর সীলের মুদ্রা অঙ্কিত করার প্রয়োজন হতো সেগুলি মূলত শহরেই কেন্দ্রীভূত ছিল।... বণিকেরাও এইসব সম্পত্তিবান মালিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল,... লোথালের বাণিজ্যপণ্যে মুদ্রিত সীলমোহরেও তা প্রমাণিত হয়’’।[৪] হাবিব আরও বলেছেন, ‘‘সীলের উপর অঙ্কিত প্রাণী যদি গোষ্ঠীপ্রতীক হয়, তবে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সিন্ধু সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষজন একটি শক্তিশালী বিকশিত গোষ্ঠীতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল’’।[৪] অর্থাৎ প্রাচীন সিন্ধুযুগ থেকে পরিণত সিন্ধুযুগে ব্যক্তি সম্পত্তির বিকাশের ধারাটি স্পষ্টতর যে হচ্ছিল তা পরিষ্কার।

সিন্ধু সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ সালে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত রাভী নদীর তীরে। হরপ্পা স্তরের সূচনা পর্ব খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ পর্যন্ত। হরপ্পা স্তরের সংহতি পর্ব খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ পর্যন্ত। হরপ্পা স্তরের অন্তিম পর্ব খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ পর্যন্ত। কালানুক্রমিক সূচিতে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতা তার উৎকর্ষের যুগে ছিল একটি নগর সংস্কৃতি যা উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন এবং বাণিজ্য দ্বারা টিকে ছিল। পরিণত সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, ধোলাভিরা, গানওয়ারিলা (চোলিস্তান), কালিবাঙ্গান, রাখিগড়ি ইত্যাদি মহান শহরগুলি তৈরি করেছিল। এটি বিশ্বের তিনটি প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে একটি, অন্য দুটি হল সুমেরীয় এবং মিশরীয় সভ্যতা, এবং এটি ভৌগলিকভাবে সবচেয়ে বিস্তৃত। সিন্ধু এবং ঘাঘঘর-হাকরা নদী এবং তাদের উপনদীগুলির অঞ্চলে প্রায় ১৪০০ টিরও বেশি শহর এবং বসতি পাওয়া গেছে। হরপ্পা এবং মাহেঞ্জোদারোর মতো বৃহৎ শহরগুলির জনসংখ্যা ৩০০০০-৬০০০০ এবং সিন্ধু সভ্যতার মোট জনসংখ্যা ১-৬ মিলিয়ন বলে অনুমান করা হয়েছে।[৬] শহরগুলিতে সমতল ছাদযুক্ত পোড়া ইটের ঘর, বিশাল বিশাল গণ-স্নানাগার, সুপরিকল্পিত নিকাশী ব্যবস্থা, বড় এবং ছোট রাস্তা এবং পৃথক বাসস্থান সহ অত্যাধুনিক নগর বিন্যাস এবং পরিকল্পনা ছিল। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলির বিন্যাস থেকে নানাস্তরীয় মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ধোলাভিরা সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্র বলছে, ‘‘It [*the figure*] exhibits the typical three-tier major divisions of a Harappan city– namely Castle (Citadel), Middle Town and Lower Town. These divisions possibly represent hierarchical city dwelling by separate population groups and were located at distinct positions and elevations. The Castle was built at a central high location closer to the reservoirs flanked by the Bailey and Middle Town while the Lower Town was located at a lower level outside the fortification wall’’[৭] অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ‘‘হরপ্পার শহরে তিনটি বিভাগ ছিল, দুর্গ বিশিষ্ট উপরের অংশ, মধ্যবর্তী শহর ও নিম্ন শহর। শ্রেণি-বিন্যাস ভিত্তিক নগরগুলিতে সম্ভবত পৃথক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অবস্থান ও উচ্চতা (elevation) বিশিষ্ট স্থানে বসবাস করত। ধোলাভিরার দুর্গটি জলাধারগুলির কাছাকাছি একটি কেন্দ্রীয় উচ্চ স্থানে নির্মিত হয়েছিল এবং তা প্রাচীর এবং মধ্যবর্তী নগর দ্বারা বেষ্টিত ছিল ও নিম্ন-নগরীটি দুর্গ প্রাচীরের বাইরে নিম্ন স্তরে অবস্থিত ছিলদ। এগুলি থেকে সমসাময়িক সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি চিত্র পরিষ্কার হয় বলে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সিন্ধু উপত্যকার বড় বড়

নগরগুলির ‘‘নগর-দুর্গদ (সিটাডেল), যেখানে শহরের কর্তাব্যক্তিরা বাস করতেন, আর অপরটি ছিল তথাকথিত ‘নিচের শহর’।’’... শহরের এই দ্বিতীয় অংশটি সাধারণত তৈরি হত জ্যামিতিক আয়তক্ষেত্রের আকারে। অপরপক্ষে শহরের নগর-দুর্গটি তৈরি করা হোত শহরের বাকি অংশের চেয়ে উঁচু করে, ইটের তৈরি বেশ উঁচু মঞ্চের উপর। এই উঁচু মঞ্চ নগর-দুর্গকে বন্যার হাত থেকেও রক্ষা করত’’।[৫] বন্যা ছিল সেই সময়ের ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঐতিহাসিকদের মতে যা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ হতে পারে। অর্থাৎ সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষরাই বন্যার কবল থেকে বাঁচার তাগিদে সুরক্ষিত নগর-দুর্গে থাকতেন। কালিবাঙ্গার প্রত্ন-নিদর্শন বলছে, নগর-দুর্গের সঙ্গে ‘নিচের শহর’-এর যোগাযোগ ছিল দুটি সংযোগ ফটক দিয়ে, অর্থাৎ প্রয়োজনে তা বন্ধ করে দেওয়া যেত। সারকোতাদের নগর-দুর্গটি ‘নিচের শহর’ থেকে পৃথক করা হয়েছিল একটি দুর্গপ্রাকার দিয়ে।[৫] ‘দুর্গগুলির’ অন্দরের বিভিন্ন অংশে সমর-কৌশলগত ব্যবস্থাপনার রকমফেরও ছিল। কোথাও কিছু অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল, আবার কোথাও সাধারণ। ‘‘একটি আভ্যন্তরীন ‘কেল্লা’ ছিল, যেখানে সম্ভবত অভিজাতরা বাস করতেন, এবং একটি ‘প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গপ্রাঙ্গণ’, যেখানে হয়ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিকরা থাকতেন’’।[৫] নগরদুর্গ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত ওই সব অভিধাগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকদের দেওয়া এবং স্তরবিন্যাস অনুযায়ী অভিজাতবর্গের কোন স্তর কোন সুরক্ষা বলয়ে থাকতেন তাও তাঁদেরই অনুমান নির্ভর। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য যে ছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে স্পষ্ট।

মৃত্যুর পর সিন্ধু-নাগরিকদের কবরস্থ করার প্রথা ছিল। কবরগুলিতে যেসমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উপলব্ধ হয়েছে সেগুলি থেকে সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টি কিছুটা সামনে আসে। যেমন, একশ্রেণির নাগরিকদের ‘‘কবর দেওয়া হোত নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও অলঙ্করণ-করা পাত্রাদি সহ’’, আর একশ্রেণির মানুষের ‘‘কবরের সাজসজ্জা ও উপকরণ ছিল অনেক গুণে বেশি সাদামাটা ধরনের’’।[৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, মধ্যপ্রস্তরযুগ অতিক্রম করে নবপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগের শুরুর দিক থেকেই ভারতীয় আদিম মানুষ পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের যুগ থেকে কৃষিকর্ম ও পশুপালনের যুগে উত্তরণ ঘটিয়ে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করেছে, যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে এবং সিন্ধু সভ্যতার জন্ম দিয়েছে কেবল নয় বৃহৎ নগরভিত্তিক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট পরিণত সিন্ধু-যুগে সামাজিক বৈষম্যভিত্তিক দুইটি শ্রেণি অর্থাৎ রাজনীতির পরিভাষায় শ্রেণি বিভাজন যে ঘটেছিল তাও পরিষ্কার। ‘‘এখনও পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে যেসমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা চলে যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ছিল শ্রেণি-সমাজ উদ্ভবের আগের যুগের এই মর্মে কিছু কিছু পন্ডিত যে মত পোষণ করে আসছেন তার সমর্থনে উপযুক্ত ভিত্তি নেই’’।[৫] অর্থাৎ ‘egalitarian society’-র অস্তিত্ব যে ছিল না সেই দিকটি নির্দেশিত হয়। মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের পথে যখন সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হয় ও রাষ্ট্রের জন্ম হয় তা বিকাশের মধ্যদিয়ে দাস-দাসমালিক পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হয়- যেখানে পরস্পরবিরোধী দুই শ্রেণি হল দাস-মালিক ও দাস। এখন আলোচনা করা প্রয়োজন সিন্ধু সভ্যতায় দাসের জন্ম হয়েছিল কিনা এবং তা ক্রমে দাস-ব্যবস্থার সূচনা করেছিল কিনা।

দাস প্রথার জন্ম

প্রথম কথা হল, কেন্দ্রীভূত নগর সভ্যতা গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করা, শহরবাসীকে বাঁচিয়ে রাখতে গ্রাম থেকে খাদ্য সমেত নানাবিধ সামগ্রীর সুষ্ঠ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখা, রাস্তা-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির পরিচর্যা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নদী ও সড়ক পথে পরিবহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড সিস্টেম অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সংগঠন ‘ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি’ বলেছে, “The regularity of plan and construction suggests some form of government with an organization and administrative capacity”. ওই সভ্যতায় ‘‘...an early stage of class division’’ যে সৃষ্টি হয়েছিল তাও স্বীকার করা হয়েছে।[৬]

অতি সাম্প্রতিক কালে প্রাপ্ত কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ভিত্তি করে একটি গবেষক-দল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সমেত অনেক নতুন দিকে আলোকপাত করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননস্থান থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন উদ্ভিদের অবশেষের ১১৪৪ টি নমুনা পরীক্ষা করে একটি স্টাডি-গ্রুপ সর্বাপেক্ষা সংহত হরপ্পাযুগের সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গবেষণা করেছে। গবেষকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা Antiquity-র ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে, ‘‘...crops were likely processed away from Indus cities like Harappa by a workforce large enough to process and store the clean crop before transportation to the city.”[১০] অর্থাৎ উৎপাদিত শস্য শহরে পাঠানোর আগে হরপ্পার মতো শহরগুলোর বাইরে ফসল মাড়াই ও গুদামজাত করার কাজে একটা বিশাল কর্মীবাহিনী নিযুক্ত হত। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, "Overall, then, these findings suggest that the processing of cereals like wheat and barley in the IVC [*Indus Valley Civilisation*] was carried out under the centralised control of village sites by Indus urban centres”.[১০]

অর্থাৎ তাঁদের গবেষণা থেকে উপলব্ধ হয়েছে, শহরের বাইরে কৃষিজ দানা শস্যের প্রক্রিয়া (ফসল মাড়াই করে তুষ মুক্ত করা ইত্যাদি) প্রভূত পরিমাণে সম্পন্ন হত, বিশাল সংখ্যক কর্মীবাহিনী সেই কাজে যুক্ত থাকত এবং প্রক্রিয়াজাত উৎকৃষ্ট সেই গম, বার্লি ইত্যাদি হরপ্পার শহরের বাসিন্দাদের খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করা হত। এখান থেকে যেটা পরিষ্কার হল, ১) কৃষকরা উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন করত, ২) সেই পণ্য প্রক্রিয়ার জন্য কর্মীবাহিনী ছিল, ৩) উদ্বৃত্ত পণ্য একদল ব্যবহার করত যারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকত না এবং ৪) এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল।

এখন এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার শাসকরা কেমন ছিলেন? জোনাথন মার্ক কেনোয়ার ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের রাজ্যশাসন প্রণালীর সঙ্গে হরপ্পা নগরের তুলনা করে দেখিয়েছেন, ‘‘সুযোগ্য শাসকবর্গের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার পৃথক প্রাচীরবেষ্টিত স্তূপে, অথবা ধোলাভিরার নগরদুর্গে। প্রাচীরবেষ্টিত স্তূপ শাসকবর্গের বিবিধ গোষ্ঠীকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে নির্মিত হত ও বিশেষ শিল্প-অঞ্চলে কারিগরদের দ্বারা নির্মিত বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর তাঁদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে অনুমতি দেওয়া হত’’।[৩]

ইরফান হাবিব লিখছেন, ‘সিন্ধু সমাজের বাসগৃহগুলির মানের মধ্যে প্রচুর তারতম্য পাওয়া গেছে। শহরের কেন্দ্রস্থলের এক বৃহত্তর অংশের বাড়িগুলি ছিল পোড়া ইটের, চতুর্দিকে প্রশস্ত আঙিনা, কূপ, স্নানের জন্য নির্মিত পাটাতন, শৌচাগার এবং বিশাল বিশাল ঘর। কিছু কিছু বাড়ি ছিল তিনতলা পর্যন্ত। শহরের আর একধারে ছিল এক-ঘর বিশিষ্ট ছোটো ছোটো কুঁড়ে বাড়ি, সেগুলি সম্ভবত ভৃত্য বা দাসেদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত’।[৪] শহরের একদিকে বসবাসের নানান সুবিধাযুক্ত বসতবাড়ি অন্যদিকে বস্তিতুল্য অপ্রশস্ত কুঁড়েঘরের অবস্থান ইত্যাদি থেকে যে সিদ্ধান্তে অনেক ঐতিহাসিক উপনীত হয়েছেন তাহল, ‘‘হরপ্পা-যুগের শহরগুলিতে ক্রীতদাসরাও ছিল। তারা বাস করত দীনহীন কুটিরে, আর ফসল মাড়াইয়ের কাজ করত, ভারি বোঝা বইত এবং সম্ভবত ভূগর্ভস্থ নর্দমার আবর্জনাদি পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাত। হরপ্পায় নগর-দুর্গের প্রাকারের ওধারে ... ফসল-মাড়াইয়ের চাতালগুলির একেবারে পাশেই এমন সমস্ত দীনহীন কুটির পাওয়া গেছে যেগুলি দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে সেখানে ছিল মুচলেকাবদ্ধ মজুর কিংবা ক্রীতদাসদের বাস’’।[৫] অন্য ইতিহাসবিদদের লেখাতেও একই স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, ডি এইচ গর্ডনের কথায়, ‘‘হরপ্পায় এমন কুলি লাইন রয়েছে যেখানে শ্রমিকরা শস্যভাণ্ডারের কাছাকাছি বসবাস করত, বাসস্থান ও শষ্যভাণ্ডারগুলির মাঝে থাকত সারি সারি চাতাল যেগুলির উপর তারা শস্য পিষে ময়দা তৈরির কাজ করত’’।[৮] তিনি আরও বলেছেন, ‘‘এখানে পাওয়া পোড়ামাটির কিছু মূর্তি (যেমন উপবেশনরত নারী-পুরুষের মূর্তি, নিজের দুই হাঁটু জড়িয়ে রয়েছে, মাথায় পরা গোল বাটিটুপি) আসলে ক্রীতদাসদের মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়’’।[৫, ৮]

সিন্ধু অঞ্চলের সংগে তখন জলপথে মধ্য এশিয়ার নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। যে পণ্যসামগ্রী রপ্তানী হত তারমধ্যে এমনকি দাসও ছিল। ইরফান হাবিবের মতে, ‘‘সিন্ধু অঞ্চল (মেলুহহা) থেকে মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে দাসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি নরবলির প্রথা প্রচলিত থাকে তবে তারজন্য হতভাগ্য দাসদের বেছে নেওয়া হত।”[৪] অর্থাৎ দাসদের ‘জীবন্ত পণ্য’ হিসাবে সরবরাহ করা হত। দেবরাজ চানানা বলেছেন, ‘‘...গ্রামীন জনসমষ্টির মধ্যেই দাসেদের অস্তিত্ব ছিল। শহরে যে এঁরা ছিলেন তা আরও নিশ্চিত। ...গৃহদাস ও ভৃত্যদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দাস আর বেতনভোগী শ্রমিকও নিয়োগ করতেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। মহেঞ্জোদারোয় ব্যারাকের মত দুসারির বাসগৃহের আবিষ্কারই এ তথ্যের প্রমাণ দেয়’’।[১১]

অস্ট্রেলিয় প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড (ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডি এইচ গর্ডন নয়) বলেছিলেন, ‘‘বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়, ‘‘যেকোনো গ্রামের চেয়ে কয়েকশ গুণ বড় জনসংখ্যা; পুরোদস্তুর বিভিন্ন পেশার দক্ষ মানুষ যেমন, কারিগর, বণিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পরিবহন শ্রমিকদের মতো বিশেষজ্ঞ; একটি শাসক শ্রেণি যা কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন সঞ্চয় করে; বিরাট ইমারতের ন্যায় বসতবাড়ি; তথ্য নথিভুক্তকরণ এবং লিখিত ব্যবস্থা যা ছাড়া

কোনও শহর পরিচালনা করা অসম্ভব; ...এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় না এমন উপকরণ পাওয়ার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো থেকে ধোলাভিরা, রাখিগড়ি এবং কালিবঙ্গান প্রভৃতি সমস্ত বড় হরপ্পা সভ্যতার স্থানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য"।[১২] অর্থাৎ বিশ্বের প্রাচীন নানা নগর-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত নগরীগুলির সাদৃশ্যের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড (১৮৯২-১৯৫৭) সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। "Childe, as both academic and activist, was heavily influenced by Marxism"। অর্থাৎ তিনি মার্ক্সবাদ দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সাল থেকে কয়েকবার স্ট্যালিনের সময়ের সোভিয়েত দেশ ভ্রমন করেছেন এবং সেদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদদের তাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[১৩] উল্লেখ্য, এঙ্গেলস যখন 'Origins of the Family, Private Property and the State (1884) বই লিখছেন তখনও সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার না হওয়ায় তাঁর লেখায় আর্যদের কথা ছিল, সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখ ছিল না। কিন্তু গর্ডন চাইল্ডের লেখায় সিন্ধু সভ্যতার কথা পাওয়া যায়।

Origins of the Family, Private Property and the State বইয়ের শুরুতে আছে, "মর্গানই প্রথম ব্যক্তি যিনি আদিম মানুষের ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট ক্রম প্রবর্তন করেছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত উপাদান তার পরিবর্তন সাধন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শ্রেণীবিভাগ নিঃসন্দেহে বলবৎ থাকবে"। মর্গান প্রবর্তিত ওই ক্রমগুলি কী? Savegery, Barbarism এবং Civilisation. প্রথম পর্ব অর্থাৎ Savegery অবস্থায় মানুষ পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং প্রাকৃতিকভাবে যেমন সেগুলি পাওয়া যেত তেমনভাবেই ব্যবহার করত। Barbarism অবস্থায় বন্য পশুকে সে গৃহে পালন করতে এবং চাষাবাদ করতে শিখেছে এবং এই কাজের দ্বারা তার প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে। Civilisation হল সেই পর্যায় যখন "knowledge of the further processing of nature's products, of industry proper, and of art are acquired." অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদকে শিল্প এবং শিল্পের প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান অর্জন করেছে।[১৪] Civilisation উদ্ভবের পর্বটি বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। গর্ডন চাইল্ড এঙ্গেলস-মর্গান তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাই চাইল্ডের উপরোক্ত মন্তব্য আমাদের আলোচনাকে সাহায্য করবে।

স্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'দ্য ইন্সটিটিউট অফ ইকোনমিক্স অফ দ্য অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস অফ দ্য ইউ এস এস আর' দ্বারা প্রকাশিত 'পলিটিক্যাল ইকনমি'-র প্রথম খণ্ডে প্রাচীন কালে দাস-ব্যবস্থা কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ আছে। "ইতিহাসে প্রথম আদিম গোষ্ঠী সমাজ থেকে দাস-মালিকানা ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছিল প্রাচীনকালে প্রাচ্যের দেশগুলিতে। মেসোপটেমিয়া (সুমের, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া ও অনান্য), মিশর, ভারত ও চীনে দাস মালিকানাধীন উৎপাদন পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ সালে, কিন্তু কখনই খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালের পরে নয়"।[১৫] যে সময়ের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০-২০০০ সালে, তা ভারতের ক্ষেত্রে সিন্ধু যুগকেই বোঝায়। যদিও ভারতে এর প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি বলে বিতর্ক আছে। ট্রান্স ককেশিয়াতে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালে দাস-মালিকানাধীন উৎপাদন পদ্ধতিই ছিল প্রধান; খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৪০০ সাল পর্যন্ত খোরেজেমে একটি শক্তিশালী দাস রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল; গ্রীসে দাস-মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৪০০ সালে; এশিয়া মাইনর, ম্যাসেডোনিয়াতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ১০০ সালে। যে রোমের দাস ব্যবস্থার কাহিনী সভ্যতার ইতিহাসে গৌরবের বিষয় হিসাবে বর্ণিত আছে তা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ২০০ সালে বিকাশের সর্বোচ্চস্তরে পৌছেছিল।[১৫] আবার পৃথিবীর যে যে জায়গায় এই ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল তা একদিনে হয়নি, ধীরে ধীরে তা বিকাশের শিখরে পৌঁছেছিল। উপরোক্ত ইতিহাস থেকে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

দাস-দাসপ্রভু ব্যবস্থা বিকাশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এখন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা অর্থাৎ যখন সমাজে শ্রেণি বিভাজন হয়নি ও রাষ্ট্রের জন্মের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি, সেই অবস্থা থেকে স্তরে স্তরে দাস-দাসমালিক ব্যবস্থায় উত্তরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, আদিম সাম্যবাদী বা 'গণ' (Clan) সমাজের প্রথম স্তর ছিল মাতৃতান্ত্রিক। বাসস্থানের আশপাশের ছোটো ছোটো চাষের জমি চাষ করা, ফসল মাড়াই ও গুদামজাত করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, পোষাক প্রস্তুত করা, সন্তান লালন করা, পশু পালন প্রভৃতি কাজ নারীদেরই পরিচালনা করতে হত এবং পুরুষদের জীব-জন্তু ও মৎস্য শিকারের কাজে দূরে দূরে যেতে হত। অর্থাৎ সেই সময়কার মানুষের জীবনের বাস্তবতা অনুযায়ীই 'গণ'-সমাজ পরিচালনায় নারীরাই নেতৃত্বকারী ভূমিকায় থাকত। সর্বমোট

কয়েক ডজন দলবদ্ধ মানুষ যারা রক্ত সম্পর্কিত তারাই ছিল ‘গণ’-র সদস্য। মাতার দিক থেকেই রক্তের সম্পর্ক নির্ধারণ হত। এই হল, ‘মাতৃতান্ত্রিক গণ’।

এক একটি ‘গণ’-র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বেশি উৎপাদনের প্রয়োজন হয়, উৎপাদিকা শক্তিরও বিকাশ ঘটে। ‘‘উৎপাদিকা শক্তির আরও বিকাশের পর যাযাবরদের গোরু প্রজনন (চারণ অর্থনীতি) ও আরও বিকশিত কৃষিকাজ (শস্য উৎপাদন) ছিল পুরুষের কাজ। এই ধরনের পশুপ্রজনন ও কৃষিকাজ আদিম গোষ্ঠীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করল, মাতৃতান্ত্রিক ‘গণ’, এর জায়গা দখল করল পিতৃতান্ত্রিক ‘গণ’। নিয়ন্ত্রণকারী পদপমর্যাদা চলে গেল পুরুষের হাতে। সে নিজেকে ‘গণ’ সমাজের প্রধানের পদে বসালো। পিতার দিক থেকেই রক্তের সম্পর্ক নির্ধারণ শুরু হল। পিতৃতান্ত্রিক গণের অস্তিত্ব ছিল আদিম গোষ্ঠীগত সমাজের শেষ পর্বে’’।[১৫] এই পিতৃতান্ত্রিক গণ সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় গোষ্ঠীপতির জন্ম। এই গোষ্ঠীপতিরাই ধীরে ধীরে লাঠির জোরে গোষ্ঠী সম্পত্তিকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার শুরু করল। এটাই ধীরে ধীরে ব্যক্তি সম্পত্তির বিকাশ, আদিম গোষ্ঠী সমাজের ভাঙন ও শ্রেণির আবির্ভাবের সূচনা করে।

‘‘প্রথমে দাসপ্রথা এসেছিল একটা পিতৃতান্ত্রিক বা ঘরোয়া চরিত্র নিয়ে। তুলনামূলকভাবে দাসের সংখ্যা ছিল কম। দাস শ্রম তখনও উৎপাদনের ভিত্তি ছিল না। অর্থনীতিতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করত। অর্থনীতির লক্ষ্য ছিল বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের চাহিদা পূরণ করা। এই অর্থনীতিতে বিনিময়ের উপকরণ প্রায় ছিল না বললেই চলে। দাসদের উপর প্রভুর আধিপত্য তখনও ছিল সীমাহীন কিন্তু দাস শ্রম ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ’’।[১৫]

উৎপাদিকা শক্তির আরও বিকাশ হতে থাকল, তার ফলশ্রুতিতে সামাজিক শ্রম বিভাগের জন্ম হল, বিনিময় যোগ্য উপকরণ বৃদ্ধির ফলে বিনিময়ের ক্রম বিকাশ হল এবং এইভাবে দাস মালিকানাধীন সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের ভিত্তি তৈরি হল। বিনিময়ের উপকরণের সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে আছে কাপড় বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎপাত্র তৈরি করা সহ নানা কারুশিল্পের ক্রম বিকাশ। ‘‘কারুশিল্প ও বিনিময়ের বিকাশ জন্ম দিল শহরের। সেই সুদূর অতীতে, দাস মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থার ঊষালগ্নে শহরের জন্ম হয়েছিল। প্রথম দিকে শহরের সাথে গ্রামের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে কারুশিল্প ও বাণিজ্য শহরে কেন্দ্রীভূত হল। অধিবাসীদের জীবনধারা ও পেশায় গ্রাম ও শহরের পার্থক্য আরও বেশি করে সুস্পষ্ট হতে লাগল’’।[১৫] ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে শহর আলাদা হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হল।

শহরের মানুষ কৃষিকাজ থেকে মুক্ত হয়ে কারুশিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করল। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত রইল। কারুশিল্পজাত পণ্য যেমন গ্রামের কৃষকদের প্রয়োজন হত, কৃষিজ খাদ্য সামগ্রী বেঁচে থাকার জন্য শহরের বাসিন্দাদের সংগ্রহ করতে হত। ফলে বিনিময় অপরিহার্য হয়ে পড়ল। ‘‘বিনিময় যোগ্য পণ্যের পরিমাণ যত বাড়তে লাগল, বিনিময়ের ভৌগোলিক পরিধিও তত বিস্তৃত হতে লাগল। বণিকদের সৃষ্টি হল। এই বণিকেরা লাভের আশায় উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনত এবং সেই পণ্যকে নিয়ে যেত বাজারে, ভোক্তার কাছে বিক্রির জন্য। কখনও কখনও এই বাজার হত উৎপাদনের জায়গা থেকে অনেক দূরে’’।[১৫]

উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশ সম্পত্তির অসাম্য বৃদ্ধি করে, বীজ থেকে শুরু করে উৎপাদনের হাতিয়ার ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, গরীবরা ঋণের জন্য ধনীদের কাছে যেতে বাধ্য হয়, ঋণ শোধ করতে না পারলে ধনীরা তাদের জমি কেড়ে নিয়ে দাসে পরিণত করত। ঋণ হিসাবে জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা উভয়ই নিতে বাধ্য হত। জমিও ব্যক্তি সম্পত্তিতে পরিণত হতে শুরু করেছিল। জমি কেনাবেচা ও বন্ধক দেওয়া শুরু হয়েছিল। সুদখোরের ঋণ শোধ করতে না পারলে খাতককে জমি ছেড়ে দিতে হত এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত নিজেকে বিক্রি করে দাসে পরিণত হতে হত। ‘‘এইভাবে সম্পত্তি হিসাবে জমি, সম্পদ হিসাবে টাকা, অসংখ্য ক্রীতদাস দাস মালিকদের হাতে জমা হতে থাকে। ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতি ক্রমাগত ভাঙতে থাকে, অন্য দিকে দাস মালিকানাধীন অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী ও বিস্তৃত হতে থাকে, তা উৎপাদনের সমস্ত শাখায় ছড়িয়ে পড়ে’’।[১৫] বিশ্বের দেশে দেশে যেখানেই দাস-দাসমালিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার গোড়ার কথা এটাই।

* * *

দাস ব্যবস্থা গড়ে ওঠার উক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উল্লেখ করলাম। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় কিনা তা দেখা দরকার। এর বহুবিধ লক্ষণ যেমন, গ্রাম ও শহরের বিভাজন, উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি ও কারুশিল্পে বিভক্ত হওয়া, বিনিময় প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ, বণিকী ব্যবস্থার সৃষ্টি ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনে পণ্য নিয়ে বণিকদের বহুদূর এমনকি অন্যদেশে (মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি) যাতায়াত- এসবই সিন্ধু সভ্যতায় বিশেষ করে তার পরিণত যুগে পাওয়া গেছে। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের

সাম্প্রতিকতম গবেষণায় তা লিপিবদ্ধ আছে , যা এই নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতায় শ্রেণি বিভাজন যে হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই, আর শ্রেণি বিভাজন হলে দাস ও দাসমালিকের জন্ম হতে বাধ্য যা সিন্ধু যুগে ঘটেছিল। যদিও সিন্ধু সভ্যতায় সম্পূর্ণভাবে দাস-দাসমালিক উৎপাদন সম্পর্ক ভিত্তিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছিল কিনা তার প্রামাণ্য উপাদান পাওয়া যায়নি। আকস্মিক অবলুপ্তি যদি না ঘটত তাহলে ইতিমধ্যে শ্রেণি-বিভাজিত এই ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে কোন স্তরে উন্নীত হত তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে ‘প্রায়-ইতিহাসের’ যুগে সিন্ধু সভ্যতাতেই শ্রেণি বিভাজন সেই অর্থে শ্রেণি সংগ্রামের যে সূচনা ঘটেছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন না করলে এই নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সিন্ধু সভ্যতায় সমাজ শ্রেণি বিভক্ত হয়েছিল এবং দাসের জন্ম হলেও তারই ধারাবাহিকতায় বিবর্তনের পথে পরবর্তী স্তরগুলি কি এদেশে এসেছিল, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। না তা হয়ত ঘটতে পারেনি, সিন্ধু সভ্যতার আকস্মিক অবলুপ্তির জন্যই তা সম্ভব হয়নি। সিন্ধু-হরপ্পাযুগের অন্তিম পর্বে প্রায় সমসাময়িক কালে বা কিছু সময় পরে মধ্য এশিয়া থেকে একটি পরিযান হয়েছিল যারা ছিল একটি ভাষা গোষ্ঠী এবং পরবর্তীকালে আর্য নামে পরিচিত হয়। এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। তারা Savegery ও Barbarism স্তরে ছিল, অর্থাৎ শিকার ও সংগ্রহকারী (hunter-gatherer) অবস্থা থেকে পশুপালন ও চাষাবাদের স্তরে উত্তরণের পর্বে ছিল তাদের অবস্থান। এই পরিযান ঘটার অনেক পরে ভারতে নগর ভিত্তিক Civilisation বা সভ্যতা আবার গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ভারতে আর্যদের অবস্থান প্রথমে ছিল গোষ্ঠী সমাজ হিসাবে-সমাজ বিবর্তনের ধারায় পরিণত সিন্ধু যুগের এক ধাপ পিছন থেকে শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা। লৌহের ব্যবহার শেখা, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, ধীরে ধীরে স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি, সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে অসাম্যের জন্ম, বৈদিক সমাজের উদ্ভব, দাস ও ক্রীতদাস প্রথার জন্ম, এসব ক্রমপর্যায়ে ঘটেছিল। এর ধারাবাহিকতায় শ্রেণি বিভাজন ও রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই রাষ্ট্র ভ্রুণ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৪০০ সালে মগধ ও মৌর্য-যুগে উত্তর ভারতে প্রথম বড় বড় রাষ্ট্র গঠিত হয়। সেই রাষ্ট্রগুলি কেমন ছিল, তার শ্রেণি চরিত্র কী ছিল, শ্রেণি সংগ্রামের জন্ম হয়েছিল কিনা সেই আলোচনা এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়।

যাই হোক, উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার, সিন্ধু-হরপ্পা যুগেই যে এদেশের সমাজে প্রথম শ্রেণি বিভাজন ঘটেছিল এবং দাস ও দাস-মালিকের জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। □

তথ্যসূত্র :

১। Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. 1, Progress Publishes, Moscow, 1969

২। Tony Joseph, 'Early Indians', Juggernaut, 2021

৩। India- Historical Beginnings and the Concept of the Arya, National Book Trust, India

৪। Irfan Habib, 'The Indus Civilisation', Tulika, 2003

৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২

৬। Proto-history- Archaeology of the Harappan Civilization, 2002

৭। T. Sengupta and others, 'Did the Harappan settlement of Dholavira (India) collapse during the onset of Meghalayan stage drought?', Journal of Quarternary Science, December 2019

৮। D. H. Gordon, 'The Pre-historic Background of Indian Culture', 1958

৯। A Brief History of Science, Breakthrough Science Society, 2021

১০। Nathaniel James et al., 'Taphonomy and labour at the Indus Valley site of Harappa (3700–1300 BC)', Antiquity, Vol. 99, Issue 403, February, 2025, pp.83-100, DOI- https-//doi.org/10.15184/aqy.2024.196

১১। Dev Raj Chanana, 'Slavery in ancient India', People's Publishing House Private Limited, 1960

১২। 'The Urban Revolution'. (1950). The Town Planning Review. 21(1)-3-17

১৩। https-//www.marxists.org/history/etol/writers/faulkner/2007/xx/vgchilde.html

১৪। F. Engels, 'Origins of the Family, Private Property and the State', 1884

১৫। পলিটিক্যাল ইকনমি, খণ্ড ১, ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস।

অ্যাবসার্ড ড্রামা

ßÂ÷Âò ðtú&I

ÛßÂ§ÂÂÃ¶Ç¸Â§Â Âòt¤Âá±¸ÂÃþÃ¶Ã±ÂèÂò±Î ðË¤Â ðú¿ßÂÈÃõþ Ã¶Ç¸ÂÞ÷ûþ¿ÕËÂ ÂÛ¿áÊËÂþÕ±ü±÷±Þ÷ ±ñËÈ÷õþßÂ ÃÇ¸ÂÂ¿òõþ ÃÊ÷Îþ û ëÂÄÕþ¿÷ùù, Î ÂÂ÷ýù, 'ð±Ì í, ú¿ÕËþÂ ÂßÂÂ ¿ðËüþ ÝËëÂ¾ÃÊ ÂËÈßÂþÕ¿õÂÂûþàÅ üÚÅõþ¼ÕËÈõþßÂÂèò õùËÈò, 'Û÷ò ¿òàÂ ÎÂÃ¶ÊÂßÂò Îð¿à¿õ¾ Â¿õþÂÚßÂ ÛõÑ Õ¿öÂÈÎ ÂËÈõþ Îõ¿ÂËÂ ðÌ í¼ÃÊõþÕòÂ Õ¿öÂ Î Âýù ÕÂõþÕËÈõþßÂ§Â Ü± Îð ËÈ õþòÂßÂü¥óËÈßÂÇ ßÂüÚÅ õþ ÕÂõÇ õù±õþ öÂ± Î òý¾ ÕËÈõþßÂÂèò õùËÈò, 'Ûí Âèò ¿÷ËÈ Õ¿öÂÛ ßÂþ, Î Â¿÷ù ð±Ì í'¼Ûõ õþÕü±ûßÂ ÛßÂ§ÂÂõÚ Ã¶ÊÂÇõþ Âü±ý Î ÃËÂ§ÂßÂþòÂËü÷Ëü±ÂËõþÂ± Â¿õ¼ò ÂËÃ Ã¶Ê±Âèò±õþ ÎŽÂËŠ ðù¿ÂüÃ¶Ç¸Â§Â ÂÂ. Õ±¿ ßÂî ÂÛõÑ ¿õðûÂî Âòë ÂßÂËÕÇ÷Çü×Ãð ±ÂèòáËÈ õþÃ¶ÇÑ±Î ÂËÈ ßÂ¼ ¿ßÂ ü÷Ëü±ËßÂÂ ¿õðûÂî Âòë ÂËÕ ¿õð¿ÂË ¿ÈÜø¸õËÂÂË ßÂËõþ¿¼q ñÅÕËÈ ËÈò, '¿ÕËÐ Î ÂÛ ÕËÂ±ÛßÂÂèò ÷±òÂ¸ ÛßÂ§ßÂÃþÕõþ÷Ëü±ËßÂ Â¿ÕËþßÂÂõþõþ¸ Ûù ¿ÕÃþûÝ Îü ¿õËÈõþ±ßÂü±±èßÂÕË¦ Õ Î ±üËËßÂ ËÈòÂò, Îüý×ËËÈõþ Â¿÷ ßÂÃËþ±¼Ûõþ ÂË×ÃòË ü÷Ëü±ËßÂÂèÂÛ Î áËÈò Õ±¿ ËÈ¾Õ ËÈ± Õ ËÈõþÕËÈõþ Õü±õþ Ã¶ÊËÃ', 'ýËÈÃþ ÕËÂ¥ËÃ' 'ú±Ãú±Ï òËÈÃÕÃËÈú¿ ßÂ Õ¿öÂÛ ý×ËÈõþ Ã¶ÇÑÏ±¼Õ ËÈõþßÂ§Â ü÷Ëü±Ã ùà±ýËÈÃ, 'ÛëÂÛßÂ§ÂÛúËÈõþ±ÛßÂÂÃ òËÂ, 'ÕËÈõü±ËÇ Â¿ ËÈÃÂËõþÛ¿ÛËÏ ËÈË Â õ±ËßÂÂÃ Õï ¿õÎ Â ±ÕËÈßÂÂËõþÕ¿òËÈò ÛËÈËò òËÂ¼ßÂÃ¾ ÕËÈõþßÂ§Â ±òÂ¼õþÛ¿Þ ÜËÈý, 'ÕËÈõü±ËÇ Â¿ ËÈÃËÕËÈõþ üËÈ Õ±¿ÂËÃ¿ÂÑ ú ý×Ûý×òËÈËÃË±ü¥óÃ¾

õÎ Â±ò òËÃËÂò±õþ

üËÂñÛ&ËÈ±ÕËÈËÂýù, ßÂËÃ ÕËÂ± òËÃËÂ ¿õÛ¿ ¿ËÈËÂÂ±ËÕËÕËÎ ÂËÂ¿ÂÎ Â¼Î ýÝ÷ò òÛ¼ßÂ¸Â±ËÃËÂ ÕËÈ¼ßÂ Õ±¿ ßÂÂî Â¿õËÃËú±ËõËü±ËÈ ÃËÂ¿¿ÕÃÜ÷ÕËÂÛ ÷ÂÃ# ± ÕËÈËßÂü¥óË Âý×ÃËÕõþ ÷Û ÃÛ¿ÕËÈËÏ±ÃËÂõþÛ§Â ËËÃýÝ Î ÂËËÂ ÂËÂ Î Â ýù ÕËÈËÃËÂ Õ± Ç±¸ËÃËÂü±Ñ ÛßÂ Õõ¦ ÃËÂ ÂËÃÂŽËË Â Î÷Ý¸ßÂ òËÃËÂ ÕËÂ¼ ËÂÕËÈË±

üËÈÂßÂÂ, Îú' ËÂõþ ýËÈõþ ËÂËËÂÎ õËÈßÂÂ ßÂ÷ÅßÂÂÂßÂÂ ÛËËÂòËÂÃ¶ÊËÈÂËÂ Î òÝÛÎ üË Ã×ËÕËÃßÂ ü÷ßÂüÎ Î÷Ü¿ßÂÂ òËÂÂÎ ßÂ ±õ ÕËÂßÂËÂ òËÂüõ&ËÈ± ÷ËÈ ýËÈÂ, õ±Ï ËÈ ü÷ËËÂ ÂËÂ ëÂ ËÈ üÎ ÃËÂÂËõõþ ßÂÃËÃËÂÕËËõËÂÂÕËËÂÎ ßÂËÕËËÃËËÕÕËËÃËËÃ ÂÂ÷ ßÂËÃËËÂËÂõ±Â ËÈÃÕË Â÷ËÈ ÃËÂ÷ËËÂ ¿ßÂÂ ÷ÁüÂ òËÃËÂ Î Â Ã¶ÊËÈÂËÂ± ðÂ Â ðúßÂÕËÈ Ûù ÎòËÂËÂòËÂõ±Îò Â¿ ÎÂËÂ òËÂßÂËÂÃ¶Ç Î Â¼Ûò ÎüËÂßÂÂ÷ÁßÂÂ¼

ËÂõþÝ Õ±¿ ßÂ

Õ±õþËËÈò, ßÂŠ ýËÈ ÛßÂÂ ËÈø ËÂËÈõþÕ±ËÈËÈõþ ÎßÂÂÝ ËÈø ÕÑËÈõþ÷±ÞÈ ËÂ ËÈÂ±ßÂŠ ÛËÈËÈ ü÷ËÈÂËÂËÂËÈ ü÷ËÈÃ¶ÊËÈ ÎÏ ËÈßÂ¾Î ÕËÂ Ï ßÂËÂËÂËÂý ËÈ, ËÈÕËÈßÂËÈ ËÂËÂÃ ËÈ ËÂßÂËÂý ËÈ ÛßÂÂËÂõËÈ Õ ËÈËßÂ¼ËÈ communicate—ßÂËÈ Â ý×ËÂÕËÂ÷ ËÈËÈ ßÂÕËÈÂËÂÈ ËÂËÈ Â ËÈò±ËÈ òËÈ ËÈ ßÂËÂÂ Õ±ËÈ Ã¶ÊËÈÂ¼Ûò ÛËÈ ßÂËÂÂËÂ Õ ò ËÂ Â÷ ÛÛÂ ËÂËÂÂ Î Â ËÈ ÕÎ ¦ ËÈÂ ËÂËÂËÂ òËÈ ËÂËÈ Â ýËÈ¼Ûò Îï ËÈË×ßÂŠ õ± ÕËÈËÂ ëÂËÂ¾ Î Â× ßŠ ýù 'FORMATIVE EXPRESION OF A CONTENT' õ± ÎßÂÝ ËÂËÈËÂ ËÂ÷ËÈ Ã¶ÊßÂ¼ ËÈ×ÛËÈ ËÂËÂËÂËÈ ÕËÈ ÷ËËÂËÂËÈ Ã¶ÇËÈ ËÂßÂ ËÈ ËÂý×ËÕËÈ ßÂËÈ ÕËÈËÂÎ ßÂËÈ ßÂËÈËÂËÂ ËÈÕËÈËÂ ý ßŠ ËÂËÈËÂ ËÂßÂËÈ ËÈÕËÈ ßÂÎ ËÈËÂËÈËÕËÈËÂ Õ±ËÈ ËÂËÈ Õ ËÂËÈ ËÂËÈ Ûý×ËËÈ ËÂÇ ÕËÈËÂ÷Ç ËÈÇËËÈ ËÈËÂ ËÈ ËÈ Î ËÈ ËÈËÂ ËÈ ËÂ ËÈ ËÈ ßÂËÈ ËÈ ËÂËÈ ËÈËÂ ËÈ Û ËÈËÈ ËÂËÈ Î Â ËÈ ËÂËÈ ËÈËÂ ýËÈ ýËÈ ÕËÈËÂ ËÈËÕËÈËÂßÂËÈ ËÂ

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1955 [illegible] Waiting for Godot [illegible] farrago of pointless chitchat [illegible] Godot-[illegible]

[illegible] “It may provide a new language, new idea, new approaches and a new vitalized philosophy to transform modes of thought and feelings of the public at large in not too distant future,” [illegible]

[illegible] “Absurd is that which is devoid of purpose... cut of from his religions, metaphysical and transcendental roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless,” [illegible] Amedee’ [illegible]

[illegible] Molloy'-[illegible] "And the words I uttered myself and which must nearly always have gone, with an effort of the intelligence were often to me as the bunging of an insect...It is true that in the end, by dint of patience, we made ourselves understand but understood with regard to what, I ask of you and to what purpose." [illegible]

[illegible] 'The Chairs' [illegible] 'Waiting for Godot'- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] "As far as I concerned I have never been able to understand the difference that is made between the comic and the tragic. As the comic intution of the absurd it seems to me more conducive to despair than the tragic. Comic offers no way out ....I say coducive to depair', but in reality it is beyond depair of hope" [illegible] "Human makes me conscious with a free lucidity, of the tragic or desultory condition of man... humans is the only possibility we posses of detaching ourselves" [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 'The Maids' [illegible] "I tried to establish a distantation which is allowing a declamatory tone, would carry theatre into the theatre. I thus hohped also to obtain the abolition a of characters... and to replace them by symbols as far removed as possible, at first, from what they are to signify and as far as possible and yet she attached to it in order to link by this sole means author and the audience; in short, to make the characters on the stage merely the metaphores of what the were to represent.” [illegible]

[illegible] (Deductism) [illegible]

[illegible] “I had closed my eyes it was wonderful” [illegible] Invasion’ [illegible] “why does one say? 'it happens'? Who is that 'it'? what does it wants from me?... I have lost too much time thinking about these things. What I want is not the meaning of words, no the volume and their moving. I shall no longer search for anything, I will went in silence, motionless.” [illegible]

[illegible] Who is afraid of Virginia Wollof ’- [illegible] A Delicate Balance [illegible] Zoo Story’- [illegible] 1934 [illegible] ‘Three tall women’ [illegible] ‘Six Characters in Search of an Author’- [illegible] (absurdity) [illegible] Henry IV’- [illegible] ‘Right you are, (If you think so)- [illegible]

[illegible] (bizarre of surreal predicaments) [illegible] (elements of realism and fantastique)"-[illegible] "You will never be happy if you continue to search for what happines consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life." [illegible] 'Myth of sisyphus'-[illegible] "A world that can be explained by reasoning, however faulty, is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of 'Illusions of light man feels a stranger. He is an irremediable exile, became he is deprived of memories of lost homeland as much as he lacks the hope of a promised land to come. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of 'absurdity."

[illegible] 'Metamorphosis'-[illegible]

[illegible]

[illegible] Unifying thread'-[illegible] content of intellect' [illegible] 'material condition'-[illegible]

[illegible] absolute [illegible] absolute [illegible]

[illegible]

[illegible] Myth of Sysiphus' [illegible] "A world that can be explained by reasoning, however faulty, a simpler world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels stranger. This is an immediate exile, because he is deprived of memories of a lost homeland as much as he lacks the hope of a promised land to come. The divorce between man and his life, the actor and his settings, truely constitutes the feeling of absurdity." [illegible] absurd' [illegible] 'absurd' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 'Absurd'

বাংলাভাষা, বাংলাদেশ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনীতি

অঞ্জনাভ চক্রবর্তী

দেশ হারিয়েছেন সোনালী খাতুন। আর কিছুদিন গেলে যে প্রাণটিকে তিনি গর্ভে ধারণ করে রেখেছেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই হয়ত জন্ম-অনাগরিকের তিলক পরবে সেও!

১৫ আগস্ট ২০২৫, ভারতের স্বাধীনতার ৭৮তম বর্ষে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন, 'অনুপ্রবেশ'ই দেশের মূল সমস্যা। এই অনুপ্রবেশকারীরাই সব চাকরি কেড়ে নিয়ে দেশের যুব সমাজকে বেকার করে রেখেছে। জনবিন্যাস তারাই বদলে দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় বীরভূমের সোনালী খাতুন আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বাংলাদেশের জেলে। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন, আইনি চক্কর শেষ হতে হতে যদি তাঁর সন্তান বিদেশের জেলে ভূমিষ্ঠ হয়, দেশ হারাবে হয়ত সেও! সোনালী তাঁর স্বামী এবং তাঁদের আট বছরের কিশোর সন্তান সেই হতভাগ্য ভারতীয়দের একজন, যাঁদের বিনা বিচারে সীমান্ত পার করে বিদেশে জোর করে ঠেলে দিয়েছে নিজের দেশেরই সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। জুন মাসের শুরুতে দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সোনালিরা তিনজন। ২৬ জুন কোনও আদালতের নির্দেশ ছাড়াই দিল্লি পুলিশের কথায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তাঁদের ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের সরকারও তাঁকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে জেলে ভরেছে। কাগজকুড়ুনি সোনালীদের কাছে আদালত এক দূরতিক্রম্য গন্তব্য। ফলে দিল্লির নিম্ন কোর্টে একটা মামলা হলেও তা বাতিল হয়ে যায়। পরে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সহায়তায় কলকাতা হাইকোর্টে একটা মামলা হয়েছে। এর আগে মালদহের আমির ২২ দিন এমন করেই দেশ-হারা হয়ে ফিরে পেয়েছেন স্বদেশের মাটিতে ফেরার অধিকার। পে-লোডারে তুলে কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেশ ছাড়া করার নজিরও আছে। আসাম থেকে সীমান্ত পার করে দেওয়া ভারতীয় কিছু নাগরিকও অসীম দুঃখকষ্ট সয়ে অবশেষে ফিরতে পেরেছেন। আবার বড়সংখ্যকই পারেননি।

সম্প্রতি ভারতের মূলত হিন্দিভাষী এলাকায় বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার যেন হিড়িক পড়ে গেছে। দিল্লি, নয়ডার মতো কসমোপলিটন শহরে এই পরিযায়ী শ্রমিকরাই মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত ফ্ল্যাট বাড়ির ভরসা বহুকাল ধরেই। হঠাৎ সেই মানুষগুলিই কেমন করে সন্দেহের তালিকায় উঠে গেলেন, তা যেমন হতভাগ্য বস্তিবাসীরাও জানেন না, ফ্ল্যাট-অধিবাসীদের বেশিরভগেরই তা অজানা। হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র জুড়ে তো রীতিমতো অভিযানই চলছে তথাকথিত বাংলাদেশি ধরার। কোপ পড়ছে সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের ওপর, আর ধর্মে মুসলিম হলে তো কথাই নেই। তাঁর গায়ে বিদেশি স্ট্যাম্প পড়া এক রকম নিশ্চিত। স্বাধীনতা দিবসে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর তার তীব্রতা আরও নিশ্চয়ই বাড়বে! প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রবেশ তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণ করতেই যেন বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইনও এই একই সময় চালু হয়েছে। তার জোরে সন্দেহ হলেই পুলিশের হেড কনস্টেবল গোত্রের কোনও কর্মচারীই বিদেশি বলে যে কোনও মানুষকে গ্রেপ্তার করবার অধিকারী হয়ে উঠলেন। এর জন্য রাজ্যে রাজ্যে স্থাপিত হবে ডিটেনশন ক্যাম্প। আদালতের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব সঠিকভাবে যাচাই করা, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ঠিকানা যাচাই করা, তারপর বিদেশি প্রমাণ হলে যে দেশের নাগরিক বলে প্রমাণ হবে তার কর্তৃপক্ষের সাথে কথার ভিত্তিতে 'পুশব্যাক' করা। এই পদ্ধতি অবলম্বন না করলে যে কোনও ভারতীয় নাগরিককে শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষ, প্রাদেশিক বিভেদের শিকার বানিয়ে দেওয়া খুবই সোজা। আসামে আধা-বিচারবিভাগীয় 'ফরেনার্স ট্রাইবুনাল'গুলি ধর্মীয় এবং ভাষা ও প্রাদেশিক বিদ্বেষ থেকে পরিচালিত হয়ে ভারতীয় নাগরিকদের হেনস্থার হাতিয়ার হয়ে উঠছে বহু ক্ষেত্রেই। এই কারণেই ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখে শঙ্কিত হয়, দিল্লি পুলিশের 'বাংলাদেশি ভাষা' সংক্রান্ত চিঠিতে তেমন আশঙ্কাই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার বাইরে অন্য রাজ্যে বাস করা বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশি ভাষা বলে যে কিছু হয় না, খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশের ভাষা হিসাবে 'বেঙ্গলি' বা বাংলাই তালিকাভুক্ত, এ তথ্য দিল্লি পুলিশের

কাছে অজানা হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাহলে? কেন দিল্লি পুলিশ লিখল কথাটা?

অপর করার ষড়যন্ত্র

আসলে, প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রবেশ বিরোধী জেহাদ থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ‘উইপোকা’ তত্ত্ব, সব কিছুর মধ্যেই সাধারণ বা ‘কমন’ হল মুসলিমরা অপর। আরএসএস-এর পাঠশালায় তাঁরা যে কল্পিত হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণা নির্মাণ করেছেন, তাতে মুসলিমদের স্থান হওয়ার কথা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের থেকে অনেক নিচে। তাঁদের পূজ্য সাভারকরের ‘হিন্দুত্ব’ পুস্তক থেকে শুরু করে গুরু গোলওয়লকরের ‘চিন্তা চয়ন’ কিংবা ‘উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড’ বই বলছে, ভারত নামে ভূখণ্ডটার আসল মালিক উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। শূদ্র, নিম্নবর্ণের হিন্দু, দলিত, জনজাতি ইত্যাদিরা থাকবে তাদের পায়ের তলায়। মুসলিমদের থাকতে হবে কোনও রকম নাগরিক সুবিধা ছাড়া, হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়ে। কিন্তু চাইলেই এই অ্যাজেন্ডার পুরোটা তাঁরা যে দেশে চালাতে পারবেন না, তা তাঁদের থেকে বেশি কেউ বোঝে না। তাই মুসলিম মাত্রেই বিদেশি, এই তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের দরকার। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শোষণমূলক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার চালক হিসাবে তাঁদের সমস্যা। এই বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রটির আসল মালিক যারা, সেই পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে জনগণকে শোষণের কাজটাতে সরসরি হাত লাগাতে হয় তাঁদেরই। ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে মানুষের যে ক্ষোভ জমা হয়, তা সামলে ভোটে গদি রক্ষাটা যথেষ্ট সমস্যার বিষয়। তাই সর্বদাই দেশের এক অংশের মানুষকে আর এক অংশের বিপদ হিসাবে তুলে ধরে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে তাঁদের চলে না। আতঙ্ক তৈরি না হলে, এক অংশের বিরুদ্ধে অন্য অংশের ত্রাতা সাজা যায় না। এতে উপরি পাওনা হিসাবে ‘সন্ত্রাসবাদীরা সব দিকে ঢুকে পড়ছে’— এই আতঙ্কের ঝড় তুলে অস্ত্র ব্যবসার কাজে অধিকাংশ সরকারি তহবিল নিযুক্ত করা এবং নাগরিক সুরক্ষার নাম করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলা টিপে মারার মতো কাজেও কিছুটা জনসমর্থন আদায়ে সুবিধা হয়। এই ক্ষেত্রে বাংলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠী খুব সহজ শিকার।

জনগণ, কর্তৃপক্ষের শঠতা

২০২৪-এর জুলাইতে বাংলাদেশে যে অভ্যুত্থান ঘটেছে। তাতে অত্যাচারী শাসকের উচ্ছেদ ঘটেছে। যদিও সঠিক এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে অভ্যুত্থানের ফল আত্মসাৎ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মৌলবাদী কিছু শক্তি এবং ক্ষমতালোভী পুঁজিবাদের সেবক গোষ্ঠী। এই অভ্যুত্থান ভারতীয় শাসক শ্রেণিকেও ভয় পাইয়েছে। জনসাধারণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজে ক্ষমতা দখল করতে রাস্তায় নেমেছে, এই দৃশ্য কোনও দেশের বুর্জোয়া শাসকের কাছেই সুখকর নয়। তার ওপর বাংলাদেশে ভারতীয় শাসকদের পছন্দের শেখ হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভ থেকে ভারতীয় একচেটিয়া এবং লগ্নি পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছে। এটা ভারতীয় শাসক শ্রেণির চিন্তা বাড়িয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকা, জাপান, চিনের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে টক্করে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এই পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের মাথা তোলার চেষ্টা ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের কাছে আশীর্বাদ। কারণ ওই মৌলবাদীরা ভারতে সব দখল করতে দলে দলে লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এই আতঙ্ক তৈরি করতে পারলে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’- রাজনীতির সুবিধা হয়। ‘হিন্দু বিপন্ন’ এই আতঙ্ক ছড়ানোর খুবই উর্বর জমি তৈরি হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সারা দুনিয়ার মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও দুর্বল অর্থনীতির দেশ থেকে অপেক্ষাকৃত সবল অর্থনীতির দেশে কিছু অনুপ্রবেশ ঘটে। পেটের দায়ে রোজগারের সন্ধানে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নেয়। এর মর্মান্তিক উদাহরণ মিলবে কানাডা হয়ে আমেরিকায় চোরাপথে ঢুকতে গিয়ে বরফে জমে ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যুর সংবাদে। হাতকড়ি পরা ভারতীয় নাগরিকদের মার্কিন সামরিক বিমান থেকে নামার দৃশ্য এই যন্ত্রণায় আরও জ্বালা যোগ করেছে। ২০২৩-এর ডিসেম্বরে পাচার হওয়া ৩০৩ জন ভারতীয় ভর্তি বিমান আটক করেছিল ফ্রান্স। দারিদ্র-পীড়িত, গৃহযুদ্ধে দীর্ণ দেশগুলি থেকে দলে দলে মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত ও শান্ত দেশের দিকে ছুটছে। তুরস্কের উপকূলে ভেসে আসা সিরিয়ার শিশু আয়লান কুর্দির ছোট্ট দেহটা আজও মানুষের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে যায়। প্রতি মাসেই ছোট্ট নৌকায় ঠাসাঠাসি করে ভূমধ্যসাগর পেরোতে গিয়ে বহু শরণার্থীর সলিল সমাধি ঘটছে। গ্রিসের সীমান্তে মাংস চালানের ফ্রিজার গাড়ির মধ্যে জমে গিয়ে মৃত শরণার্থীদের লাশের ছবিও দুনিয়া দেখেছে। মায়নমারের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা ডিঙি নৌকায় বঙ্গপোসাগর, ভারত মহাসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ছেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতেও এমন দরিদ্র মানুষ কাজের সন্ধানে ঢোকেন। সেটা অবশ্যই বেআইনি এবং তা আটকানোর মতো রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীও সীমান্তে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে উপস্থিত। আছে সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীও। তার মধ্যেও কিছু বেআইনি

অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, কিন্তু এই সংখ্যাটা কখনওই এমন হতে পারে না যে, তা ১৪০ কোটি ভারতবাসীর রোজগার কেড়ে নিতে পারে। এমনটা হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁর দপ্তরের শীর্ষ আমলাদের উচিত অপদার্থতার জন্য দেশের মানুষের কাছে জবাবদিহি করা।

অনুপ্রবেশ ও অমৃতকাল

সংসদে দুই বিজেপি সাংসদ শম্ভুশরণ পটেল এবং নীরজ শেখর লিখিত প্রশ্ন করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কি অনুপ্রবেশ বাড়ছে? গত ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কত জন অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন? উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন ১৫৪৭ জন। ২০২৪ সালে ১৬৯৪ জন এবং ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৭২৩ জন। অর্থাৎ, আগের দু'বছরের তুলনায় চলতি বছরের গড় কম (আনন্দবাজার ডট কম, ২০ আগস্ট ২০২৫)। তাহলে অমিত শাহের ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী, ২০০৫-এ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বলা পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি বাংলাদেশি ভোটার গেলেন কোথায়! সম্প্রতি আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জনবিন্যাস পাল্টে যাচ্ছে। কী পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তিনি এ কথা বলেছেন তা জানা নেই। ২০১১-র পর সেন্সাসও হয়নি। তবে ২০১৯-২১-এর পঞ্চম জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য দেখাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জন্মহার কমেছে। সীমান্তবর্তী নয় এমন জেলার সাথে এই হারের পার্থক্যও অনেক কমেছে। সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকরা দেখাচ্ছেন, সীমান্তবর্তী জেলায় এই হার যতটুকু বেশি,তা এই জেলাগুলির মানুষের দারিদ্র ও শিক্ষার কম হারের কারণে ঘটছে। তাহলে, ট্রাম্প সাহেবের অভিবাসী বিরোধী জেহাদের সাথে এই জেহাদ একই স্তরের নয় কি! বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে অতি দক্ষিণপন্থী যে সমস্ত শাসকদের উত্থান ঘটছে তারা তাদের দেশের সমস্ত সমস্যার দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন, শরণার্থী এবং অভিবাসীদের ঘাড়ে। ট্রাম্প একা নন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মতো ইউরোপীয় দেশেও অভিবাসী শরণার্থী বিরোধী জেহাদ চলছে। ভারতীয় উপমহাদেশেও যে অভিবাসন, অনুপ্রবেশ ঘটে তার পিছনের কারণ সেই দারিদ্র, শোষিত মানুষের অসহায়ত্ব, শাসকের অত্যাচার, অনাচার। এর মধ্যে আবার ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থী চিহ্নিত করার ধুয়ো তোলে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি। মুসলিমরা বাংলাদেশ থেকে এলে অনুপ্রবেশকারী, হিন্দুরা শরণার্থী। কিন্তু তাদেরই পরিচালিত আসাম রাজ্য সরকার হিন্দুদেরও বিদেশি তকমা দিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরছে। আসামে যে ১৯ লক্ষ মানুষকে তারা এনআরসি-তে বাদ দিতে চেয়েছে, তার বড় অংশই হিন্দু। আসাম থেকে বেআইনি পুশব্যাক হিন্দু-মুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটছে। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মুসলিমদের সাথে সাথে হিন্দুদের ওপরেও আক্রমণ হয়েছে। অতি সম্প্রতি খোদ কলকাতার শিয়ালদহ এলাকায় হোস্টেলবাসী মুসলিম ছাত্রদের ওপর বাংলাদেশি সন্দেহে আক্রমণ করেছে একদল লোক। শিলিগুড়ির মতো এলাকায় হিন্দু যুবককে বাংলাদেশি অপবাদ দিয়ে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছেন তাঁর হিন্দিভাষী মালিক। বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনে সম্প্রতি সরকার বলেছে, মুসলিমদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা বাকি সব ধর্মের মানুষ যাঁরা ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে ঢুকেছেন, তাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও, এমনকি তাঁরা বেআইনি অভিবাসী হলেও সরকার তাদের গ্রেপ্তার করবে না। সিএএ আইনে সরকার একইভাবে বলেছে, ২০২১৪-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দেশগুলি থেকে আগত মুসলিম বাদে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হিসাবে আবেদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেবে। এইভাবে ধর্মের ভিত্তিতে একদলকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টার বিষময় ফল আমরা স্বাধীনতার পর থেকে কম দেখিনি। প্রশ্ন আরও, যে সমস্ত মানুষ বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এসে বহু বছর ধরে ভারতে আছেন, পরিশ্রম করে দেশের উৎপাদনে অংশ নিয়েছেন, এই দেশটাকে নিজের করেই নিয়েছেন, তাঁদের সমস্ত সত্ত্বার সাথে জড়িয়ে আছে ভারত দেশটা, তাঁদের মধ্যে অমুসলিম যাঁরা, তাঁদের এ দেশের নাগরিকত্ব নিতে নিজেকে আগে বিদেশি ঘোষণা করতে হবে! আর বহুকাল ভারতে বাস করেও মুসলিমদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার আপরাধে পুরোপুরি দেশ-হারা হতে হবে? স্বাধীনতার 'অমৃতকালে' এই কি ভারতবাসীকে দেওয়া সরকারের উপহার! একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন ঘটনা মানা যায়?

সাভারকরের দ্বিজাতিতত্ত্ব

আসলে এর পিছনে আছে আরএসএস-এর দর্শনে থাকা দ্বিজাতি তত্ত্ব। তাদের নেতা সাভারকরের কথা ছিল, যে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ভারতে, তারা ভারতীয় জাতি, অন্যেরা ভারতে জন্মালেও, পুরুষাণুক্রমে শত শত বছর

ভারতের মাটির সন্তান হলেও অভারতীয়। আরএসএস-এর দর্শনের ভিত্তিতে বিজেপি বলতে চায়, দেশ ভাগ যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে, তাই সমস্ত মুসলিম পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশে চলে যাক। কিন্তু সব হিন্দু আসুক ভারতে— এই কথাটা কি বিজেপি বলতে পারবে? ভোটের স্বার্থে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে হয়ত এটা বলতেও পারে, কিন্তু আসামে বলবে তো! এ ছাড়াও যখনই দেশের মানুষের শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ে, তখন ধর্ম ছাপিয়ে মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে এক দলকে আর এক দলের শত্রু বানানোর দরকার হয়, সেই সময় এই হিন্দুদেরও তো অভিবাসী বলে আবার সব সমস্যার জন্য দায়ী করবেন তাঁরা! এমনিতেই উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ, দলিত, আদিবাসী, ওবিসি, পূর্ববঙ্গীয়, বাঙাল-ঘটি, পাকিস্তানি শরণার্থী ইত্যাদি কত সূত্রে যে মানুষকে তাঁরা ভাগ করেন, তার ইয়ত্তা নেই। মণিপুরে যখন মেইতেই আর কুকিরা লড়াই করে, সে লড়াই শুরু করা থেকে তা চালিয়ে যাওয়ার মদতদাতা কারা? উত্তরপূর্ব ভারতের মানুষকে দিল্লি-হরিয়ানায় নানা অপমান সূচক নামে ডাকার হোতা কারা? এই সব হিন্দুত্ববাদের ঠিকাদাররাই নয় কি? মণিপুরের পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির নেতারা কীভাবে প্রকাশ্যে জাতিদাঙ্গায় মদত দিয়েছেন তা দেশবাসী ভুলতে পারে? মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, রাজস্থান, হরিয়ানা, তামিলনাডু সর্বত্রই এই দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে মানুষকে। আসামে কংগ্রেসের পোঁতা বিষবৃক্ষের এই রকম সুফলই এখন ভোগ করছে বিজেপি।

সম্মিলিত সংস্কৃতির ভারতীয় ইতিহাস

বিজেপি যেভাবে মুসলমানদের বিদেশি তকমা দিচ্ছে তা কি এ দেশের প্রকৃত ইতিহাসের সাথে মেলে? এই প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরিসর নেই। তবু উল্লেখ করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের কথা, তাঁকে অবশ্য পুরোটা ঠিক হজম করতে পারে না হিন্দুত্ববাদীরা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘‘বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় ভরতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল। চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষাণুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।’’(সমাজ) তিনি আরও বলছেন, ‘‘মুসলমান রাজত্ব ভারতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না।... এই জন্য মুসলমানের সংশ্রবে আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা, বেশভুষা, আচার ব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া আসিতেছিল।’’(ওই) রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও, বিজেপি যাকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই বিবেকানন্দ পর্যন্ত বিজেপির মুসলিমদের বিদেশি সাজানোর অ্যাজেন্ডার সমর্থক নন। বিবেকানন্দ বলছেন, ‘‘মোগলরাজ কেমন সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না; মুঘলরা ওই জায়গাটাতে ঘা দেয়নি। হিন্দুরাই তো মুঘল সিংহাসনের ভিত্তি। জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, দারাশিকো এদের সকলের মা হিন্দু।’’ (রচনাবলি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৪) তিনি বলছেন, ‘‘মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। দারিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই।’’ (রচনাবলি খণ্ড-৫ পৃঃ ১৪৭) ‘‘ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশী কেন? এ-কথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।... বস্তুত, জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেই জন্য বাঙলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।’’ (ওই, খণ্ড-৭ পৃঃ ২২) ‘‘কেন তাহারা মুসলমান হইবে না? ...আমরা তাহাদের জন্য কী করিয়াছি?... এ জন্য অপর কাহাকেও দোষ দিও না, দোষ দাও নিজেদের ধর্মকে।’’ (ওই, খণ্ড-৫ পৃঃ ৪৩) আরও বলেছেন, ‘‘আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান– ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই-একমাত্র আশা।’’ (ওই, খণ্ড-৮ পৃঃ ২৬) আরএসএস-বিজেপি নেতারা কি বিবেকানন্দের এই বাণীও হজম করতে পারবেন?

বাংলা ভাষার স্থিতিস্থাপকতা : প্রাণময় বাংলা ভাষা

এখন হিন্দুত্বের স্বঘোষিত রক্ষকরা বাংলা বলার টান দেখেই নাকি বাংলাদেশি চিহ্নিত করে ফেলছেন! অথচ বাংলা ভাষাটার অসংখ্য উপভাষা বা ডায়ালেক্ট সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই তাঁদের। মানুষের অভিজ্ঞতা দেখায়, একই জেলার অভ্যন্তরেই কিছু দূর যেতে না যেতেই ভাষার কথ্য রূপ একটু একটু করে বদলে যায়। তার সাথে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, স্থানীয় নানা উপাদান যুক্ত হয়ে উপভাষার সৃষ্টি হয়। কলকাতার লিখিত কিংবা পরিশীলিত কথ্য রূপই একমাত্র বাংলা নয়। দুনিয়ার সব ভাষার ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটে। ইংরেজির মতো আন্তর্জাতিক ভাষার ক্ষেত্রেও এই সত্যের

পরিবর্তন হয়নি। ভারতে এক একটি প্রদেশে, এমনকি একই প্রদেশের মধ্যে পাল্টাতে পাল্টাতে হিন্দি যে কত রূপ ধারণ করেছে, তা গুনে শেষ করা মুশকিল। বাংলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকার ভাষার সাথে দক্ষিণের সুন্দরবন, মেদিনীপুর, পশ্চিমের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বীরভূম ইত্যাদির ভাষাগত পার্থক্য এতটাই, যে বহু ক্ষেত্রে তাকে এক ভাষা বলে চিহ্নিত করাটাই সমস্যার। কলকাতার বাংলার সাথে কথার টানের পার্থক্য দেখেই বাংলাদেশি বাছতে গেলে উত্তরবঙ্গ, আসামের বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরার সব মানুষকেই ত্যাজ্য করতে হয়। আবার বাংলায় যেমন সংস্কৃত, প্রাকৃত শব্দ আছে তেমনই ঐতিহাসিক কারণে আরবি, ফারসি, ইংরাজি ইত্যাদি ভাষার বহু শব্দ এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। সংস্কৃত শব্দ যেমন তৎসম বা তদ্ভব শব্দ হিসাবে বাংলায় ভিন্ন রূপ নিয়েছে, আরবি, ফারসি অনেক শব্দের ক্ষেত্রেও তাদের বর্তমান রূপ থেকে উৎসটা চেনাই দুরূহ। আবার কিছু পরম্পরার কারণে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আরবি, ফারসি শব্দ সরাসরি ব্যবহৃত হয়। কথাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, যাঁরা বাঙালি মুসলমানের 'পানি', 'খালা', 'ফুপু' ইত্যাদি ব্যবহারে বিদেশি অনুষঙ্গ খুঁজে পান তাঁরা বাংলাভাষার ইতিহাসটাকেই ভুলে গেছেন, অথবা জেনেও এড়িয়ে যেতে চান। তাঁরা ভুলে যান বিদ্যাসাগরের যৌবনকালেই (১৮৩৮) জয়গোপাল তর্কালঙ্কার আরবি ফারসির যাবনিক সংশ্রব থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে তার হিন্দু কৌলীণ্য রক্ষার চেষ্টা করে কীভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'পারসীক অভিধান'-এ দোকানের বদলে 'ক্ষুদ্রবাণিজ্যালয়' কিংবা বিপণি লিখলেও বিদ্যাসাগর কিন্তু দোকানই লিখেছিলেন। বাঙালি দোকানটাকেই গ্রহণ করেছে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি এই কৃত্রিম শুদ্ধিকরণকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেদিনই। কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং অন্যত্র কিছু আরবি-ফারসির ব্যবহার বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যই বাড়িয়েছে। সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলার বিরোধী ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কৃতের খটমটো চলন থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে। পরবর্তীকালে নজরুল যখন লিখছেন— 'চাই রুধির, রক্ত চাই, ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই/...আমাদের তরে শুধু হালাল/ দুশমন খুন, লাল সে লাল'। রুধির, রক্ত, খুন, অক্লেশে জায়গা করে নিয়েছে একই কবিতায়। তাতে ভাষাটা কোথাও দুর্বল হয়নি। বাংলা ছোটগল্পের জগতে শক্তিশালী লেখকরা অনেকেই এই ধারা অনুসরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলি যে ভাষা রীতি রেখে গেছেন। তা এ ভাষার সম্পদ। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সময় এবং তার ধারাবাহিকতায় জহির রায়হান, জাহানারা ইমাম, শামসুর রহমান, তহমিনা আনম, হুমায়ুন আহমেদ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আখতারুজ্জমান ইলিয়াস প্রমুখ যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা বাদ দিতে হলে বাংলা ভাষার অস্তিত্বই সংকটে পড়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি

বাংলায় তুর্কি শাসন ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে। তারপর থেকে দীর্ঘ সময়ে এর প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়াটাই স্বাভাবিক এবং সেটাই ঘটেছে। তাতে বংলা ভাষার কোনও ক্ষতি হয়নি বরং অগ্রগতি ঘটেছে। হুসেন শাহের আমলে মালাধর বসুর 'পরাগলী মহাভারত', বিপ্রদাস পিপলাই ও বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' সৃষ্টি হয়েছে। যে 'রোহিঙ্গা আতঙ্ক' এখন অহরহ হিন্দুত্ব ও 'হিন্দু বাঙালি'-কে রক্ষার ঠিকাদারি নেওয়া নেতাদের মুখে শোনা যাচ্ছে, সেই রোহিঙ্গাদের বাসভূমি বর্তমান মায়নমার, ইতিহাসের আরাকানের রাজসভায় বিশেষ ধারার বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। পুরনো বাংলা সাহিত্যে আরাকান রোসাঙ্গ বা রোসাং বলে উল্লেখিত হয়েছে। দৌলত কাজি, মরদন, কোরেশি মগন ঠাকুর, মহাকবি আলাওল, আব্দুল করিম খোন্দকার এ ক্ষেত্রে উল্লখযোগ্য। দৌলত কাজির 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী', আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'সপ্তপয়কর', মগন ঠকুরের 'চন্দ্রাবতী' সহ নানা সাহিত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পদ্মাবতীতে আলাওল দেবী লক্ষ্মীর রূপক বর্ণনা করছেন। তা রচিত হয়েছে রাজা সাদ উমাদার (স্থানীয় ভাষায় থদো মিন্তার)-এর মুসলিম প্রধনমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। উল্লেখ্য, এই সমস্ত সৃষ্টির সময়কালে আরাকানে এবং ভারতের সর্বত্র মুঘল ও পাঠান শাসকদের রমরমা ছিল। সে যুগে মুসলিম এবং বর্মীয় আারাকানি প্রভাবে থেকেও রোসাঙ্গ সাহিত্য বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ক্ষতিসাধন করেনি, বরং তাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর আজকের রাষ্ট্রহীন, সব দিকে তাড়া খাওয়া রোহিঙ্গারা বাংলা তথা ভারতের সব গিলে খেয়ে নিল, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য!

বিজেপির বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি বলেছেন, কবি সুবোধ সরকার আর সফিকুল ইসলামের লেখা পড়েই তিনি বুঝে গেছেন কোনটা বাংলাদেশি ভাষা আর কোনটা বাংলা। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্যের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না— ''আমি পর পর পাঁচটি উদাহরণ দিচ্ছি। দেখুন তো, শুধু পড়ে বুঝতে পারেন কি

না, কোনটা বাংলা, আর কোনটা 'বাংলাদেশি'?

১) জবাব ছাড়া সাওয়াল যহন/ চাইয়া রইসে চাইয়া,/ ঘরের দাওয়াত উড়াল দিয়া আইল/ শীতলপাটি, কুন যুগের শীতলপাটি,/ তার মুখে পরস্তাব; বন্ধু হাওয়াত/ বানছে মাচা, বানছে কেরাসিনের/ বাতির পিঠে ধুরা সাপের পেট,/ সূর্য হইল সরল খাচা।/ কি বন্ধু,/ হাওয়াত বানছো মাচা?

২) 'তু ফকির কব সে হই গেলিন বেটা!', জাঁতায় আরেক মুঠ কলাই দিয়ে, গলায় এক আশমান অবিশ্বাস নিয়ে তার আম্মা তাকে পুছেই ফেলল। জিজ্ঞাসা করার মতো এবং তার চেয়েও বেশি অবাক হওয়ার মতো বিষয় এটি আলবাৎ। তার মতো বহুত জোয়ান মর্দ এই খানকাহতে থাকত তালিব হিসেবে। তালিম-শেষে বেশিরভাগই ঘর গেরস্থালির কাজে যুতে যেত। পীর দূরের কথা, ঠিকঠাকও মুরিদও বেরোয়নি এই খানকাহ থেকে।

৩) আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ ইতিহাসের সামনে/ আমার কাঁধে দিয়েছ স্টেনগান, কোমরবন্দে কার্তুজ,/ আঙ্গুল ভর্তি ট্রিগার,/ বারুদে বিস্ফোরণে উৎকর্ণ আমার শ্রুতি/ আমার দৃষ্টিতে ভবিষ্যত/ আমি সেই ভবিষ্যতের দিকে নিশানা তাক করে উঠে দাঁড়িয়েছি/ আমার গন্তব্য ফুটে উঠেছে প্রতিটি রাস্তায়/ প্রতিটি রাজপথে/ প্রতিটি আয়ল্যান্ডে।

৪) যা বলেছে তাই। বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কী করা যায়? এ রকম করে তো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। মহতো নায়েবরা বৌকা বাওয়াকেই সালিশ মানে।

৫) 'মিছিল ত তুলিবেন, নেকচার করিবেন কায়?' গয়ানাথের এমন প্রশ্নের জবাবে সেই চ্যাংড়া নেতারা কথাবার্তা বলে ঠিক করে যে অন্তত সাতটা হাটে তারা কেউ এসে 'বক্তব্য রাখিবেন।' 'আখিবেন ত আখিবেন, আর তেরডা হাটত কি বলদ দিয়া হাম্বা ডাকাম?' গয়ানাথের এমন চড়া প্রশ্নে আবার এক দফা আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় যে, এই এলাকার দুজনকেই জোগাড় করে নেওয়া হবে।

চেনা গেল? প্রথমটি আগরতলার তনুজ সরকারের, যিনি ত্রিপুরায় প্রচলিত কথ্য বাংলার প্রয়োগ করেছেন এই লেখায়। দ্বিতীয়টি উত্তরবঙ্গের অভিষেক ঝা-র, যিনি এখানে প্রয়োগ করেছেন মালদহে প্রচলিত খোট্টা ভাষার, যাকে তিনি বাংলারই প্রকারভেদ মনে করেন। তৃতীয়টি আদতে নোয়াখালি, পরে ঢাকার ফরহাদ মজহারের কবিতা। চতুর্থ ও পঞ্চমটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্যরতন পর্যায়ভুক্ত, পূর্ণিয়ায় জীবন-কাটানো সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ঢোঁড়াই চরিত মানস ও উত্তরবঙ্গের দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ আগস্ট ২০২৫)

স্বাধীনতা আন্দোলনে অপূরিত কাজের পরিণাম

দেখা যাচ্ছে, স্পষ্টতই ভোট রাজনীতির কারবারিরা নিজেদের হিসাব মেলাতে গিয়ে সাংস্কৃতিক, সামাজিক দিক থেকে যে ক্ষতি করছেন সেটা অপূরণীয়। ভারতের মতো একটা বহু ভাষাভাষী বহু জাতিসত্তা, উপজাতি ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন সংস্কৃতির দেশে আজকের দিনে বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকলে আর্থিক, রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ন্যাশনালিটি বা জাতিসত্তা অন্যান্য জাতিসত্ত্বাকে দমন করে। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ন্যাশনালিটির জনগণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও জাতিগত-ভাষাগত নিপীড়নেরও শিকার হয়। মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের তুলে ধরা এই সত্য ভারতের পরিস্থিতিতে কতটা বাস্তব তা প্রথমে কংগ্রেস, পরবর্তীকালে বিজেপির 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান'-এর স্লোগানে স্পষ্ট। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রের সাথে আপস করে চলা বুর্জোয়া নেতৃত্ব জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অর্থেও যতটুকু সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি নেওয়া যেত, তাকেও এড়িয়ে চলেছেন। ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলার বুকে যে নবজগরণের সূচনা হয়েছিল তা মুসলিম এবং হিন্দু উভয় ধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাসম্পন্ন অভিজাতদের চক্ষুশূল হয়েছে। ১৮৮৮-তে সৈয়দ আহমেদ খান ব্রিটিশ সরকারকে দোষ দিচ্ছেন, তারা ইংরেজি শিক্ষার দাবি মেনে নেওয়ায় 'বাঙালি বা বাঙালি ধরনের হিন্দুদের হাতে' আইন প্রণয়নের ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। একই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ১৮৭০-এ ভিঙ্গার রাজা শিবপ্রসাদ, বেনারসের রাজা ইত্যাদি হিন্দু সামন্ত। (আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা, বিপান চন্দ্র) ফলে এ দেশে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জাতি গঠিত হলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, উপজাতীয় মানসিকতা ইত্যাদি দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকেই গেছে। এরই সুযোগ নিয়ে নানা ধরনের উত্তেজক স্লোগানে মানুষকে মাতিয়ে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছেন বারবার। কখনও শক্তিশালী উত্তর ভারতীয় হিন্দি বলয়ে হিন্দিকে হিন্দুর ভাষা হিসাবে তুলে ধরে মুসলিমদের কোণঠাসা করেত চেয়েছেন তাঁরা। এমনকি

হিন্দিকে সংস্কৃত অনুসারী করার নামে হিন্দিরই নানা উপভাষা, ভ্যারিয়েশনকেও চাপে ফেলা হয়েছে। উর্দুর মতো অত্যন্ত মিষ্ট ও শক্তিশালী ভাষাকে কেবলমাত্র মুসলিমদের ভাষা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের মতো রাজ্যেও সাইনবোর্ডে উর্দু মুছে হিন্দি লেখার ফতোয়া জারি হয়েছে। অথচ এ দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সাহিত্য উর্দুতে রচিত হয়েছে। হিন্দিকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে উর্দু। হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উর্দু সংলাপ, গান মানুষকে টেনেছে।

ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতা

এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় আজকাল বাংলা ভাষার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত মানুষজন বাংলা ভাষার উপর হিন্দির আগ্রাসন রুখতে শুদ্ধিকরণের নানা নিদান দিচ্ছেন। কলকাতা কর্পোরেশন তো সাইনবোর্ডে বাংলা লিখেই এর সমাধান করার নিদান দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক দাপটের বহিঃপ্রকাশ এই আগ্রাসন, তার মূল কারণ নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই যে তুলনামূলক দুর্বল ন্যাশনালিটি বা জাতিসত্ত্বার ভাষার ওপর শাসকের ভাষা হিসাবে হিন্দিকে তুলে ধরা হচ্ছে এটা তাঁরা দেখাতে চান না। ভাষার সাথে ভাষার আদানপ্রদানের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সমস্ত চলমান জীবন্ত ভাষাতে চলে, এটা তা নয়। এখানে বাংলাকে ধরেই উদাহরণ টানলে দেখা যাবে স্বাভাবিক মিশ্রণের বদলে হিন্দি-ইংরাজির এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষারূপ আধুনিকতার অজুহাতে চালু হচ্ছে, যেটা সুসংহত চিন্তার বাহন হয়ে ওঠার অনুপযুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে দীর্ঘদিন ধরেই অ্যাভেলেবল-এর অনুবাদ ‘উপলব্ধ আছে’, প্রোহিবিটেড প্লেস ‘বর্জিত এলাকা’, ম্যানেজার ‘অধিক্ষক’-এর মতো বিদঘুটে ব্যবহার বাংলা বলেই চলছে। এটা স্বাভাবিক আদানপ্রদানের বিষয় হয়নি, বাংলা ভাষারীতির সাথে এর অমিল এতটাই যে এগুলি সরকারি সাইনবোর্ডেই থেকে গেছে, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু কথ্য ভাষায় মাঝখানের বদলে ‘বিচখানে’, কেননা-র পরিবর্তে ‘কেন কি’, অথবা ‘মাহোল’, ‘ধ্যান দেওয়া’ ইত্যাদি প্রয়শই শোনা যায়। বাঙালি শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে ‘সঙ্গীত’, ‘মেহেন্দি’ ইত্যাদি অনুষ্ঠান বিয়ের অনুষঙ্গে ভালই চালু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলা সিরিয়াল, ওটিটি সিরিজের প্রভাব অবশ্যই আছে। ওই সব সিরিয়াল-সিরিজে যে ভাষায় বাঙালি পরিবার কথা বলে, যে সংস্কৃতি ও রীতি-নিয়ম, পরম্পরা তাতে দেখানো হয়, তা বাঙালির পরিচিত ঘরানার বদলে উত্তর ভারতের নকল-নবিশী ছাড়া কিছু নয়। স্কুল স্তর থেকে ইংরেজি মাধ্যমের পরিবেশে বাংলাকে ব্রাত্য করে রাখার প্রভাব এই সবগুলোকে আরও বাড়িয়েছে। বাস-মেট্রোতে স্কুল ফেরত শিশুকে মা যখন বলেন, ‘ওয়াটারটা ড্রিঙ্ক করে নাও’— কোনও সংস্কৃতির শিকড়ই যে এতে নেই, তা প্রকট হয়ে ওঠে। ছিন্নমূল সংস্কৃতির মানুষ কোনও জোরেই দাঁড়াতে পারে না।

ব্রিটিশ আমলের আগে থেকেই, এমনকি সুলতানি-মুঘল আমলেও উত্তর এবং পশ্চিম ভারতই প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশরাজ বাংলা থেকে শুরু হলেও, নানা কারণে তারও কেন্দ্র সরে গিয়েছিল দিল্লি অভিমুখেই। স্বাধীনতার পর নব্য স্বাধীন দেশে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মেই উন্নয়ন হয়েছে অসমভাবে। তার ওপর উত্তর ভারত-কেন্দ্রিক শাসকরা ১৯৫০-এর দশকে মাশুল সমীকরণ নীতির নামে পূর্বাঞ্চলের লোহা, কয়লা, তামা, খনিজ তেল ইত্যাদি কম শুল্কে বা বিনা শুল্কে সারা ভারতে পাঠানোর নীতি নেয়। তার সাহায্যে তারা উত্তরভারতে শিল্প গড়ার নীতি চালু করলেও উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের তুলো, অন্যান্য কাঁচামাল শুল্ক ছাড়ের আওতায় না থাকায় পূর্বাঞ্চলে শিল্প ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। দিল্লির শাসকদের পৃষ্ঠেপাষকতাও উত্তর ভারতের দিকেই ছিল। ফলে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভরকেন্দ্রটা পুরোপুরি উত্তরেই ঝুঁকে পড়ে। দেশ ভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনেগাষ্ঠীগত সমস্যা, শরণার্থী সমস্যা এতে আরও ইন্ধন দেয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গেও মূল ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থনৈতিক শক্তিও উত্তরভারতীয় জনগোষ্ঠীর হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচালক, অফিসের বস ইত্যাদি অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী গোষ্ঠীর বড় অংশ যখন অধস্থন কর্মচারীকে দাবিয়ে রাখতে তার ভাষাকে হেয় করতে থাকেন, এই সমাজে টিকে থাকার ইনস্টিংক্ট থেকেই অধস্তনের মধ্যে উপরঅলাকে নকল করার প্রবণতা আসে, যা ফুটে বেরোয় এক ধরনের অস্বাভাবিক এবং ব্যর্থ ভাষা-খিচুড়িতে। এ যেন সেই ব্রিটিশ যুগের ‘বাবু কালচার’-এরই একটা রূপ। সাহেবি অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা কী অপমানের কালি বাংলার মুখে মাখিয়েছে, তার সাক্ষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের গল্পে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতায় ।

বাঙালি ও বাংলাদেশি নিয়ে রাজনৈতিক জিগির

বর্তমান সময়ে যে বাংলাদেশি ধরার নামে বাঙালি বিরোধী জিগির চলছে তা মূলত রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক।

বিপরীতে, আবার একদল যখন বাঙালি অস্মিতার রক্ষক সাজতে চান সেটাও মূলত রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকেই সাজা। অস্মিতা শব্দটারই বাংলায় বিশেষ পরিচিতি ছিল না। এতদিন মারাঠি অস্মিতা শোনা যেত। শিবসেনা ইত্যাদি হিন্দুত্ববাদী, প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিগুলি মহারাষ্ট্রে বিহারি, বাঙালি বিরোধী আওয়াজ তুলতে এই আবেগকে ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসী রাজনীতিতে প্রাদেশিকতাবাদী ধরন বজায় থেকেছে। তবে এ রাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার প্রভাব, বামপন্থী আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বাঙালি, হিন্দি-উর্দুভাষী নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ এই প্রাদেশিকতাকে সংকীর্ণ ও আগ্রাসী হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু আশির দশকে তথাকথিত বামপন্থীরা সরকারি গদিতে যাওয়ার পর থেকে গদি টিকিয়ে রাখাকেই ধ্যান-জ্ঞান করে ফেলায়, বামপন্থার চর্চা তাঁদের মধ্যে একেবারেই উঠে গিয়েছিল। ফলে বহু ক্ষেত্রেই প্রাদেশিকতা, ভাষাগত অস্মিতাকে তাঁরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। আজ যেমন তৃণমূল কংগ্রেস ভোট রাজনীতির হিসাব কষে বাঙালি স্বার্থের চাম্পিয়ান সাজতে চাইছে, একই কায়দায় ১৯৮৩-৮৪ তে আসামে 'আসু' আন্দোলনের সময় বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে বাঙালি সেন্টিমেন্ট থেকে মোকাবিলা করার কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন তথাকথিত বামপন্থীরা। তাঁরা এটাকে সারা ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দাবি করে তুলতে চাননি। তাতে ভোট রাজনীতির সুবিধার হিসাব কষেছিলেন তাঁরা। এদিকে আসামে তাঁরা ঠিক বিপরীত অবস্থান নেন এই একই কারণে। ফলে বামপন্থার স্লোগান যাঁরা দিচ্ছেন, এমন বহু মানুষ প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। তাঁরা মাতৃভাষা প্রীতি দেখিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিকে ইংরেজি পড়া বন্ধ করেছেন। অথচ, নিজেদের সন্তানদের কনভেন্টে পাঠিয়েছেন। বামপন্থায় বিশ্বাসী নামী লেখক-শিল্পীরাও বাংলাপ্রেমী হিসাবে বাংলা ভাষা বাঁচানোর জন্য যে সব নিদান দিয়েছেন, তা মূলত বড় প্রকাশনা সংস্থার স্বার্থে প্রাদেশিকতাবাদী সেন্টিমেন্ট তোলারই চেষ্টা। তাঁরাও নিজেদের চর্চায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতির দিক থেকে সমস্ত সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম করেননি। এই কারণেই সততার সাথে যাঁরা বামপন্থার কথা ভেবেছেন, তাঁদের অনেকেই ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি সাজ, বাঙালি ভোজ আর বাঙালিত্বের নস্টালজিয়াতেই আটকে থেকেছেন। এর সাথে যে রক্তঝরা ইতিহাস আছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জড়িয়ে আছে, তাকে বিশেষ ধর্তব্যে আনতে চাননি। তাঁরা খেয়ালই করেন না, ঢাকার শাহবাগ আন্দোলনে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের 'আমি বাংলায় গান গাই' বাঙালিত্বের অহঙ্কার ছাপিয়ে 'দৃপ্ত স্লোগান'-এ পরিণত হয়। দেশ-কাল-ভাষার গণ্ডি ছাপিয়ে মৌলবাদ, স্বৈরতন্ত্রকে তা চ্যালেঞ্জ করে। আজকের বাঙালি বিরোধী সাম্প্রদায়িক জেহাদের মোকাবিলা করার রাস্তা পেতে গেলে নিছক অস্মিতায় না ভেসে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে তার যোগ ঘটাতে হবে। তা না হলে কেবল বাঙালি হয়ে থাকার বিরুদ্ধে কবিগুরুর সেই তিরষ্কার মুছবে না। মানুষ হওয়ার পথ হল— সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা মুক্ত মন নিয়ে উন্নত সমাজের রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া। সারা ভারতের গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের ঐক্য ছাড়া কোনও ফাঁকির পথে সমাধান আসবে না। □

> ''মহেন্দ্র বাবু, আমি কেবল দুইটি জাতি মানি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, কোন মানুষেরই কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের, মস্তিষ্কের। সে কেমন জানেন ? এই ধরুন আপনি নিজে। আপনার শিক্ষা, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, ইহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনা বোধ, ইহার উদ্যম, ইহার আন্তরিকতা, -এইগুলিই বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে-বাগ্দীই বা কি- ওইগুলা না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না।
>
> —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মহেন্দ্রনাথ করণ'কে লেখা চিঠি, আশ্বিন ১৩৩১)

পুঁজিবাদ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

দিব্যেন্দু মাইতি

প্রসঙ্গ: দুই সংকট

গত কয়েক দশকে, মানব অগ্রগতির ধারা দুটি মারাত্মক সংকটের সামনে থমকে পড়েছে— বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং অর্থনৈতিক মন্দা। দুটো সমস্যার তীব্রতা যেন বেড়েই চলেছে। প্রশ্ন হল, তাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না। ১৭শ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থায় গতি সঞ্চারিত হতে থাকে, বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলোতে। মানুষ কৃষি থেকে কারখানার নির্ভর করতে শুরু করে। শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক হতে থাকে — খাওয়া, থাকা ও যাতায়াত সবের মধ্যে যন্ত্রের নির্ভরশীলতা বাড়তে লাগল। ফলে মানব জীবনে এল প্রাচুর্য ও গতি। কিন্তু, এই গতিকে বজায় রাখতে বাড়তে থাকে জীবাশ্ম-নির্ভর জ্বালানি (fossil fuel) আর অ-পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের (non-renewable resources) ব্যবহার ও সামাজিক সাধারণ সম্পদের (common property resources) উপভোগ। এর বিরূপ প্রভাব পরিবেশের উপর থাকলেও শুরুতে তেমন প্রকাশ পায়নি। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটেছে। ফলে যে শিল্পায়ন ব্যক্তিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অচলায়তন থেকে মুক্ত করেছে। তা অর্থনৈতিক গতি-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, মানুষের জীবিকার উন্নতি শুধু নয়, জীবনে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু, এই ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফাবৃদ্ধির তাগিদে সামাজিক স্বার্থ রক্ষার দায় ক্রমাগত কমেছে। পরিবেশ রক্ষার দায়ও তাদের ক্রমশ গৌণ হয়েছে। জীবাশ্ম-নির্ভর জ্বালানি ব্যবহার উৎপাদন ক্ষেত্রে বেড়েছে। তার হাত ধরে বেড়েছে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ। এই জীবাশ্ম জ্বালানির বর্ধিত ব্যবহার এবং ক্রমবর্ধমান কার্বন নির্গমণের কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ, মানুষের স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিকে ব্যাপক প্রভাবিত করছে ও আরও করবে। এই পরিণতিগুলির মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি, আরও ঘন ঘন এবং গুরুতর চরম আবহাওয়া পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত, তাপ-সম্পর্কিত অসুস্থতা বৃদ্ধি এবং সংক্রামক রোগের বিস্তার, স্বাস্থ্যের প্রভাব ইত্যাদি। এতেই শেষ নয়, এর ফলে কৃষি, পরিকাঠামো, সম্পদ এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়ায়। একটি সাধারণ উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশের মানুষের কাছে যেমন বেকারত্ব, বৈষম্য, দারিদ্রের মতো সমস্যা গভীর হচ্ছে। তেমনই পরিবেশের বিরূপ প্রভাব অতিরিক্ত সমস্যা হিসেবে এসেছে। এ সব দেশের পুঁজি মালিক ও শাসকরা দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যাকে বেশিরভাগ সময়েই উপেক্ষা করে। তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি আনার অজুহাত দেয়। পরিবেশ ধ্বংসের তোয়াক্কা না করে কি তারা অর্থনীতির গতি বজায় রাখতে পারবে? নাকি এর ফলে বেকারত্ব, বৈষম্য, দারিদ্রের মতো আর্থ সামাজিক সমস্যার প্রকোপ আরও বাড়বে? এই প্রশ্নগুলি উত্তরের লক্ষ্যে এই নিবন্ধটির উপস্থাপনা।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। এক, উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সরাসরি পরিবেশের নানা পরিবর্তন হতে থাকে। দুই, উষ্ণতা ও তার ফলে পরিবেশের পরিবর্তন সম্মিলিত ভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই দুই বিষয়কে আলাদা ভাবে আলোচনা করা দরকার। প্রথমে দেখা দরকার, বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ইতিহাস এবং কখন থেকে তা উর্ধ্বমুখী। তারপর দেখা দরকার, তাপমাত্রা বাড়ার ফলে পরিবেশের অন্য কী কী পরিবর্তন হচ্ছে এবং কখন থেকে তা হচ্ছে। সবশেষে আসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর এর প্রভাবের কথায়।

পরিবেশের পরিবর্তনের ইতিহাস

প্রায় দু'হাজার বছরের ইতিহাসে তাপমাত্রার একটা চিত্র পাওয়া গেলেও, পুঁজিবাদ আসার আগে পর্যন্ত এর তেমন কোনও পরিবর্তন খুজে পাননি গবেষকরা। পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮৮০ থেকে বিশ্বের বার্ষিক তাপমাত্রা প্রতি দশকে গড়ে ০.০৭°C (০.১৩°F) হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সাল

থেকে তাপমাত্রা বছরে গড়ে ০.১৭°C (০.৩১°F) হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের সৃষ্ট কারণে বর্তমান পৃথিবী প্রায় ১.২°C বেশি উষ্ণ। ১৮৬১-১৮৯০ সালের গড় ভূমি-সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তুলনায় বর্তমান তাপমাত্রার পার্থক্য এবং ওঠানামা ১৮৮০ থেকেই পরিলক্ষিত করা যায় (চিত্র ১ দেখুন)। যা ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বেশ একটু উর্ধ্বমুখী। পরে এর বাড়ার হার ১৯৬০-৭০ পর্যন্ত একটু শিথিল হলেও, ১৯৮০ সাল থেকে অতি দ্রুত হারে ক্রমাগত বাড়ছে। সমস্ত উপমহাদেশেই এটা লক্ষ করা গেছে (চিত্র ১(খ))।

চিত্র ১ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন: গতি এবং ধরন

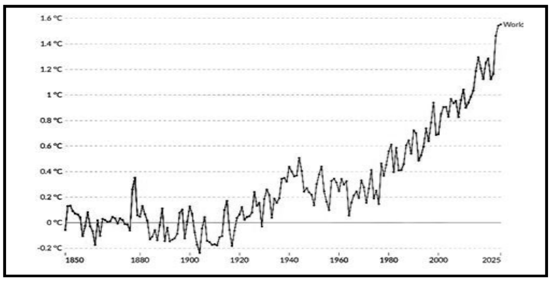

(ক) বিশ্ব উষ্ণায়ন: বার্ষিক তাপমাত্রার পরিবর্তন (অ্যানোমালি) Source- Met Office Hadley Centre - HadCRUT5 (2025)

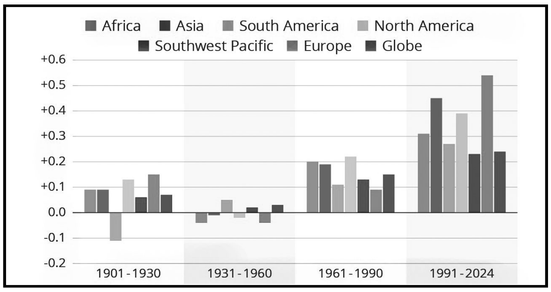

(খ) উপমহাদেশ অনুযায়ী বিশ্ব উষ্ণায়নের ত্বরণঃ প্রতি দশকে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি 0°C-এ। Source- World Meteorological Organisation (Statista)

ক্রমাগত তপমাত্রা বাড়ার ফলে, সারা বিশ্বে catastrophic বন্যা, খরা, ভূমিধস, ভূমিকম্প, বিধ্বংসী তাপপ্রবাহ এবং রেকর্ড-ব্রেকিং দাবানলের মতো বিভিন্ন চরম ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে (চিত্র ২)। বেড়ে চলেছে সমুদ্রের জল-তলের উচ্চতা, কিন্তু কমছে তার অম্লতার পরিমান। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ-জনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এই কারণে বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ০.৫ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির পরিনাম সুদূর প্রসারী। এই কারণে বিশ্বের বেশ কিছু দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমছে ও কোন কোনও দেশে তা নেগেটিভ। যদিও লম্বা সময়ের জন্য অন্যান্য ক্ষতির হিসেব ধরলে এর পরিমাণ অনেক বেশি। কোভিড পরবর্তীকালে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্যা আরও বেশি করে অনুভুত হচ্ছে। ২০২৩ সালে রাশিয়া বিধ্বংসী বন্যার শিকার হয়েছে। চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ-তাপ প্রবাহের ঘটনা ঘটেছে। যা আগে ঘটে নি। একই বছরে ভারতে হিটস্ট্রোকে অসংখ্য মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। লিবিয়াতে ধ্বংসাত্মক বন্যা হয়েছিল এবং মিয়ানমারে একটি ভয়াবহ ঝড় ব্যাপক ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটিয়েছিল। সাইক্লোন ফ্রেডি সহ দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার একটি বড় ঘূর্ণিঝড় ব্যাপক প্রাণহানি এবং বাসিন্দাদের স্থানচ্যুতি ঘটায়। ইউরোপে ২০২৪ সালে রেকর্ড-উচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায় এবং ২০২৪ সালের গ্রীষ্মে দিল্লির তাপমাত্রা ৫০°C ছাড়িয়ে যায়। ২০২৪ সালে পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, রোমানিয়া, অস্ট্রিয়া এবং ইতালি সহ মধ্য ইউরোপের বেশিরভাগ অংশ মারাত্মক বন্যার শিকার হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের চরম ঘটনার আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, পরিবেশ রক্ষার উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে বাড়ছে।

চিত্র ২ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব

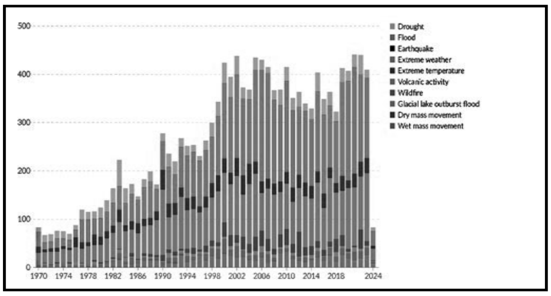

(ক) বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন

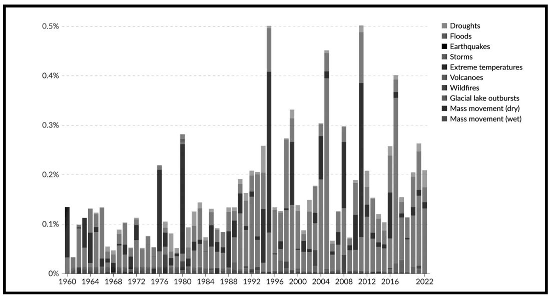

(খ) দুর্যোগ থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) অংশ হিসেবে)

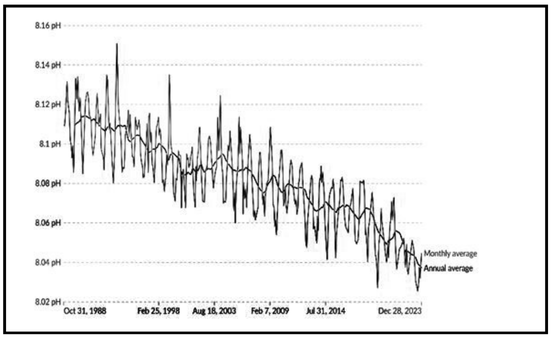

(গ) সাগরের অম্লীকরণ: গড় সমুদ্র জলের পিএইচ, হাওয়াই।

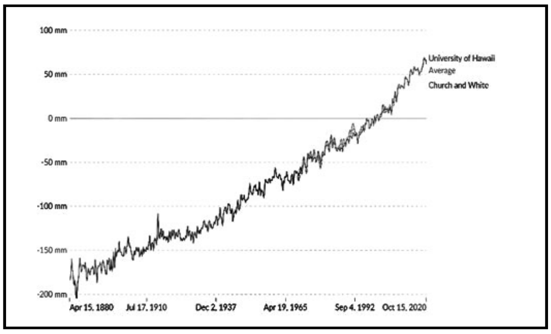

(ঘ) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। Source- OurWorldData–https-//ourworldindata.org/natural-disasters

কিন্তু, তাপমাত্রা বাড়া ও তার প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পেছনে কারণ কী? প্রধান কারণ বাতাসে কার্বনের পরিমাণ বাড়া, যা অতিরিক্ত ফসিল ফুয়েল ব্যবহারের ফলে ঘটে থাকে। পৃথিবীর গড় পৃষ্ঠ তাপমাত্রার দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি ঘটে প্রধানত বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG)-এর ঘনত্ব বৃদ্ধি থেকে। যা মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা পরিচালিত। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ৭৬% অন্যদিকে, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ফ্লুরিনেটেড গ্যাস যথাক্রমে ১৬%, ৬% এবং ২%। সুতরাং, কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য ক্ষতিকর (চিত্র ৩)। পরিবহণ এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় শক্তি আজও প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহারের মাধ্যমে আসে। বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং যানবাহন হলো এর প্রধান উৎপাদক। বিশ্বব্যাপী CO_2 নির্গমনের ৭৫% এরও বেশি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে আসে। দ্বিতীয়ত, কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণকারী গাছ কাটা এবং বন ও সবুজ ভূমির ধরন পরিবর্তন করার কারণে ঘটে। বন উজাড় বাতাস থেকে কার্বন শোষণের পরিমাণ হ্রাস করে। বিশ্বব্যাপী GHG নির্গমনের ১০-১৫% এর জন্য ঘটে। কৃষিকাজের জন্য বন কাটা (যেমন পাম তেল উৎপাদনের বিরাট আবাদ, গবাদি পশুর খামার) এর প্রধান উৎস। তৃতীয়ত, সিমেন্ট, ইস্পাত এবং রাসায়নিক পণ্যের উৎপাদনে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য GHG নির্গত হয়। চতুর্থত, বিমান ও জাহাজ চলাচল এর নির্গমনের ক্রমবর্ধমান উৎস। পরিশেষে, ল্যান্ডফিলে জৈব বর্জ্য অবাত শ্বসনের মাধ্যমে (anaerobically) পচে মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে। দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এই সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। চিত্র ৩ অনুযায়ী, গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ব্যাপক ভাবে বাড়তে শুরু করেছে মূলত ১৯৭০-৮০ সালের পর থেকে। উন্নত দেশের ভুমিকা এতে বেশি ছিল অনেকদিন ধরেই। ধীরে ধীরে উন্নয়নশীল দেশগুলির (যেমন চিন, ভারত) প্রভাব বেড়েই চলেছে। প্রশ্ন আসে, এর পেছনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কী প্রভাব! পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই কি দায়ী? যদি তাই হয়, তাহলে তো পরিবেশের এমন পরিবর্তন ২০০ বছর আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। তা হলে, পুঁজিবাদী নিয়মের কিছু পরিবর্তন কি আরও বেশি করে পরিলক্ষিত হছে? এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

চিত্র ৩ ঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের উৎস

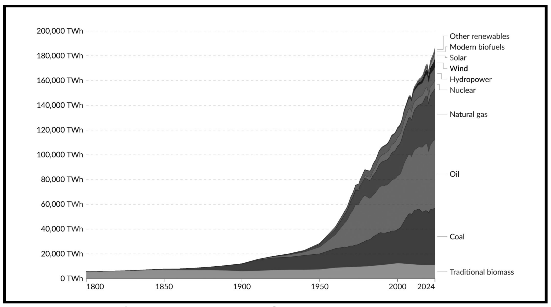

(ক) জ্বালানির উৎস অনুযায়ী ব্যবহার

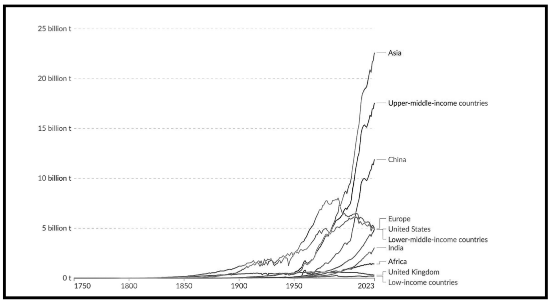

(খ) জীবাশ্ম জ্বালানি এবং শিল্প থেকে বাৎসরিক কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) নির্গমন।

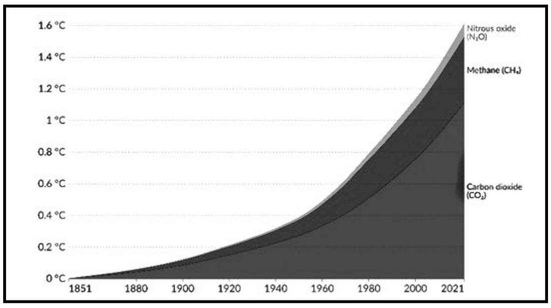

(গ) গ্যাস অনুযায়ী বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অবদান

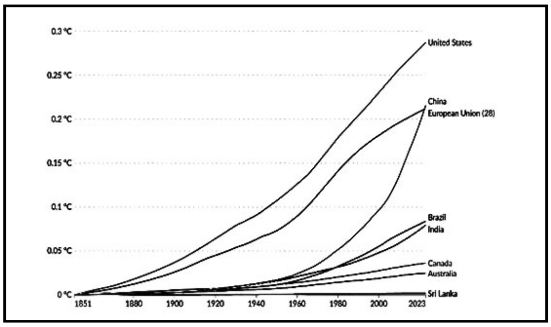

(ঘ) দেশ অনুযায়ী বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অবদান। Source— Our World in Data— https-//ourworldindata.org/data

আয়ের উপর প্রভাব

এটা স্পষ্ট যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং নীতি যা জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে, তা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্যও দায়ী। এর মধ্যে রয়েছে শক্তি উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা, শিল্প প্রক্রিয়া যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে এবং কৃষি ও বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে বন উজাড় করা। আগেই দেখেছি, গত ১০০ বছরে, বিশ্ব-তাপমাত্রা উপরের দিকে উঠেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উষ্ণায়ন ঘটেছে গত ৪০ বছরে, অর্থাৎ ১৯৮০-র দশক থেকে। উল্লেখ্য, বিশ্বে আয়ের পরিমাণ (২০১৫-র মার্কিন ডলারের দাম অনুযায়ী) ১৯৮০ সালে ২৬.৫১ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৩ সালে ৯৩.৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ৪০ বছরে প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি। এর সাথে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে ৩৩৭.৯০ পিপিএম থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ৪২১.৮৬ পিপিএম-এ পৌঁছেছে। বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইড এখন শিল্প বিপ্লবের আগের তুলনায় ৫০% বেশি। গত ৪৫ বছরে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ ২০% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে, শতাব্দীর শেষে মানুষের বেঁচে থাকা দুস্কর হয়ে উঠবে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব অনুমান করার জন্য গবেষণার পরিমাণ বাড়ছে। বাণিজ্যিক কার্যকলাপের বর্তমান হার থাকলে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব পরিমাপ করতে দুটি বিকল্প মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়—প্রথমত, বার্ষিক তাপমাত্রা এবং দ্বিতীয়ত, চরম ঘটনাগুলির ওঠানামা। দেখা গেছে যে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় তালিকায় থাকা দেশেই ১% তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাদের বার্ষিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ১.৩ থেকে ৪% হ্রাস ঘটায়। জলবায়ুর ধরন, ভৌগোলিক অঞ্চল, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং উন্নয়নের মাত্রার উপর নির্ভর করে কিছু গবেষণা কার্বনের সামাজিক খরচ অনুমান করে জিডিপি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের একটি সরাসরি প্রভাব খুঁজে পেয়েছে। বায়ুমণ্ডলে এক টন অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির হিসাব ডলারে কষতে হয়। নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, গত ১০ বছরে, কার্বনের সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ অনুমানিক প্রতি টন CO_2-এর জন্য ১২ ডলার থেকে ৫২৫ ডলারে-এ পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাপী কার্বনের পরিমাণ না কমানো গেলে খরচ আরও বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের তুলনায় ভারত কম কার্বন নির্গত করে, কিন্তু ভারতে কার্বন নির্গমনের সামাজিক ক্ষতির পরিমান প্রতি টন CO_2-এর জন্য প্রায় ৯০ ডলার। যার অর্থ হলো প্রতি অতিরিক্ত প্রতি টন CO_2-র ফলে ভারতীয় সম্পদের ৯০ ডলার ক্ষতি হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের ক্ষেত্রে CO_2 নির্গমনের অর্থনৈতিক খরচ যথাক্রমে প্রতি টনে ৫০ এবং ২৬ ডলার বলে অনুমান করা হয়েছে। অতএব, ইন্টিগ্রেটেড অ্যাসেসমেন্ট মডেল (IAM) দ্বারা অনুমান করা কার্বনের সামাজিক খরচ হিসাবে (SCC) দেশজুড়ে ০.৭% থেকে ৫% পর্যন্ত আয় হ্রাস দেখা যাবে। অন্যান্য গবেষণা আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে ৪°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্ব জিডিপিতে ৪০% হ্রাস ঘটাতে পারে। এমনকি ২°C বৃদ্ধিও মাথাপিছু বৈশ্বিক জিডিপিতে ১৬% হ্রাস ঘটাতে পারে। শক্তি, ভূমি ব্যবহার ও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রভাবের উপর নির্ভর করে কতটা আর্থিক ক্ষতি হতে পারে এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তার পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে চিত্র ৪-এ।

চিত্র ৪ঃ বিশ্ব উস্নায়নের ফলে সাম্ভাব্য মাথাপিছু জিডিপি।

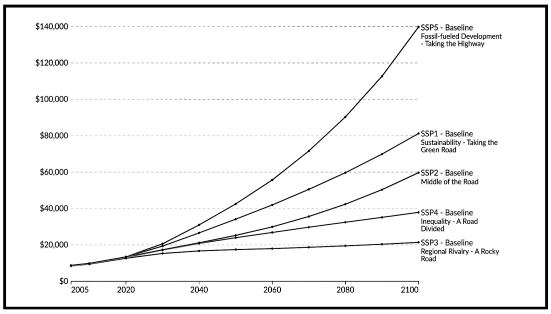

সূত্রঃ https//ourworldindata.org/

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা বিশ্বজুড়ে আরও বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে। ১৯৭০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলোর কারণে ১১,৭৭৮টি দুর্যোগের খবর পাওয়া গেছে, যার ফলে ২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের মৃত্যু এবং ৪.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। কম উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলো তাদের ভৌগোলিক কারণ এবং উন্নয়নের মাত্রার কারণে এই জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে আরও বেশি ও ঝুঁকিপূর্ণ। যা অবার তাদের দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষমতাকে সীমিত করে। অতএব, এই ধরনের জলবায়ু দুষণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও উদীয়মান দেশগুলোর জন্য আরও ক্ষতিকর। তাদের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় রাখতে গেলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে উষ্ণায়নের মোকাবিলা করতে হবে।

দেখা গেছে যে, উচ্চ তাপমাত্রা শ্রমিকদের দক্ষতা হ্রাস করে, ক্লান্তি বাড়ায় এবং কাজে ত্রুটির হার বৃদ্ধি করে। এই প্রভাবগুলি এমন শিল্পে বেশি স্পষ্ট যেখানে কাজের প্রয়োজনে মাঠে যেতে হয় বা যেখানে জলবায়ু-নিয়ন্ত্রিত করার পরিবেশ কম রয়েছে, যেমন কৃষি এবং নির্মাণ শিল্প। হিট স্ট্রেস বাড়লে শ্রমের দক্ষতা হ্রাস পায়। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বিভিন্ন ভাবে যন্ত্রপাতি অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজির উৎপাদনশীলতাকেও প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ইঞ্জিন এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি অতিরিক্ত গরম হলে তা ঘন ঘন খারাপ হয়ে অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। চরম তাপমাত্রা পরিকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতি ত্বরান্বিত করতে পারে, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাড়াতে পারে এবং পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত সম্পদের জীবনকাল হ্রাস করতে পারে। উচ্চ তাপমাত্রায় যন্ত্রকে ঠাণ্ডা রাখার দরকার বাড়ে, যা শক্তির খরচ বাড়ায় এবং শক্তি-নির্ভর পুঁজির নিট উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে।

আরও দেখা গেছে যে দরিদ্র এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির উৎপাদনশীলতার ক্ষতি উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক, কারণ তারা শ্রম-নিবিড় কার্যকলাপ এবং কৃষির উপর বেশি নির্ভরশীল। তবে, সমস্ত দেশে ক্ষতির পরিমাণ একই নয়। মধ্যম তাপমাত্রার অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলো কম ক্ষতির মুখোমুখি হয়। যেহেতু নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো কৃষির উপর বেশি নির্ভরশীল এবং এই তাপমাত্রার সাথে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাদের কম। এই দেশগুলোতে উচ্চ তাপমাত্রার জন্য ক্ষতি মারাত্মক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা ও তাকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের প্রায়শই প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব থাকে এই দেশগুলোতে।

জলবায়ু পরিবর্তন যে কয়েকটি সম্ভাব্য পথে এই অর্থনীতিগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে হ্রাসপ্রাপ্ত কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য মূল্যের বৃদ্ধি, যা মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং চরম আবহাওয়া স্বাস্থ্য সংকটের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ায়। হারিকেন, বন্যা এবং খরার মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলি পরিকাঠামোর প্রচুর ক্ষতি করে। যার ফলে পুনর্গঠনে বিপুল খরচ হয় এবং অন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটে। বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন এবং বাষ্পীভবনের বর্ধিত হার জল সংকট সৃষ্টি করতে পারে, যা কৃষি এবং শিল্প উভয়কেই প্রভাবিত করে এবং জল সম্পদ নিয়ে সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের চলে আসার প্রবণতা বাড়বে, যা শহরের পরিকাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করে। যা সামাজিক অস্থিরতা এবং সরকারি পরিষেবার চাহিদা বাড়ায়। বিনিয়োগকারীরা বেশি ‘ঝুঁকি প্রিমিয়াম’ দাবি করতে পারে, যা উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির জন্য পুঁজির খরচ বাড়িয়ে দেয়।

আর্থিক অস্থিতিশীলতার সময়ে, উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলি আরও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে রয়েছে বিনিময় হারের অবমূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ মন্দা, বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকি (sovereign risk) বৃদ্ধি, বর্ধিত হারে বৈদেশিক ঋণ এবং ভারসাম্যহীনতার সমস্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পদ-পোর্টফোলিওতে থাকা সম্পদ ধ্বংস করে। ব্যাংকগুলির ব্যালান্স শিটে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে এবং ঋণ প্রদান করার ক্ষমতা কমে যায়। যার ফলে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সৃষ্টি হয়।

উন্নয়নের উপর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কারণ এর বোঝা দরিদ্র পরিবার এবং দেশগুলোকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তাদের বৈষম্য প্রশমন এবং পরিস্থিতি মোকবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার খরচ অত্যধিক বেশি (prohibitive) হয়ে যায়। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, উন্নত দেশগুলোর তুলনায় দরিদ্র দেশগুলো বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে, যা ইঙ্গিত করে যে, বিশ্ব উষ্ণায়ন আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধির একটি অনুঘটক (catalyst) হিসেবে কাজ করে। গত কয়েক দশকে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বিশ্বায়ন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, আর্থিক উন্নয়ন এবং সরকারি নীতি সহ বিভিন্ন কারণের দ্বারা সম্পদের অধিকারে বৈষম্য প্রভাবিত হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গবেষণা থেকে জানা যায় বিশ্ব উষ্ণায়ন কম উন্নত দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির সাথে তাদের সম্পদের বৈষম্য বাড়িছে। গ্রামীণ এলাকা, যা সাধারণত দরিদ্র, শহরের তুলনায় বেশি গুরুতর ক্ষতির শিকার হয়। এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে যাদের পরিস্থিতির সাথে ব্যবস্থা পরিবর্তন করার মতো সম্পদ কম রয়েছে তারাই সবচেয়ে ঝুঁকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠী। তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতি অসামঞ্জস্য বাড়ায়, দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্থানচ্যুত করার কারণ হয়ে ওঠে। কেন না, এরা জলবায়ু-সংবেদনশীল কাজে বেশি নির্ভরশীল এবং তাদের পরিবেশের সমস্যা মোকাবিলা করার মতো সম্পদের বেশ অভাব রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বল্প মেয়াদে আয়ের বৈষম্য বাড়ায়, কিন্তু এই প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে হ্রাস পায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে বিশ্ব উষ্ণায়নে তাপমাত্রায় ১°C বৃদ্ধি যথাক্রমে জিনি (Gini) এবং থেইল (Theil) সূচকে ০.৮% এবং ১.৪% বৃদ্ধি ঘটায়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সরাসরি ভৌত সম্পদের (physical assets), যেমন আবাসন, অবকাঠামো এবং কৃষি জমির ক্ষতি করতে পারে, অথবা দিনযাপনের ধারা বজায় রাখতে সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিবারের আয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ধনী পরিবারগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক বীমা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা বা ঋণ পাওয়ার সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, যা তাদের দ্রুত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ-ভিত্তি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বেশি বাধার সম্মুখীন হয়।

ইথিওপিয়া এবং হন্ডুরাসের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জলবায়ু-সংক্রান্ত ধাক্কা বিশ্লেষণ করে, গবেষণাগুলো দেখায়, জলবায়ু জনিত কারণে সমস্ত পরিবারই ফসলহানি, চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদির মতো তাৎক্ষণিক আয় হ্রাসের সম্মুখীন হয়। কিন্তু দরিদ্র পরিবারগুলো দীর্ঘ মেয়াদেও তাদের সম্পদ-ভিত্তি পুনর্গঠন করতে হিমশিম খায়। এর বিপরীতে, ধনী পরিবারগুলো বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বা সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তাদের সম্পদ রক্ষা বা সঞ্চয় করতে আরও সক্ষম হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়ন মানব কল্যাণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান অসাম্য থাকায় মহিলাদের কাছে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো জীবনযাত্রার অভিযোজনের কম সুযোগ, আঘাতের সামনে অরক্ষিত থাকা এবং দুর্বলতার কারণে দুই পক্ষের উপর প্রভাব ভিন্ন হয়। গবেষণা ইঙ্গিত করে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃহত্তর বৈষম্যের কারণে জলবায়ু-সংক্রান্ত অভিঘাত মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হ্রাসের দিকে পরিচালিত করেছে।

এ ছাড়াও, গ্রাম শহরে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যার উপর পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৫৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতের জেলা-ভিত্তিক আবহাওয়া এবং মৃত্যুর ডেটা বিশ্লেষণ করে, গবেষণায় দেখা গেছে যে গরম দিনগুলোতে গ্রামীণ এলাকায় মৃত্যুর হার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষি এবং উৎপাদনশীলতার উপর তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাব দ্বারা চালিত হয়। ভারতের শহুরে জনসংখ্যায় মৃত্যুর হার ওই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ। উপরন্তু, ১৯৭১-২০০০ সালের ডেটা বিশ্লেষণ করে, পণ্ডিতরা আবহাওয়ার অভিঘাত এবং অপরাধের মধ্যে শক্তিশালী কার্যকারণ সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন। যা প্রাথমিকভাবে কৃষি আয়ের ওপর আঘাত দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রধান কৃষি মৌসুমে নেতিবাচক বৃষ্টিপাত এবং বর্ধিত তাপমাত্রার অভিঘাত বিশেষভাবে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। গবেষণা থেকে জানা যায় যে আবহাওয়ার ধাক্কার প্রভাব সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের উপর সম্পত্তি বহির্ভুত অপরাধের তুলনায় বেশি। আয়-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াতে (income mechanisms) জোর দেয় এমন অর্থনৈতিক মডেলের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, সময়ের সাথে সাথে অপরাধ এবং আবহাওয়ার মধ্যে একটি ধারাবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে নেতিবাচক বৃষ্টিপাত ধারাবাহিকভাবে ৫% অপরাধ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত এবং তাপমাত্রার ধাক্কা প্রায় ৪%-এ স্থিতিশীল থাকে। সেচের সম্প্রসারণ এই প্রভাবগুলো প্রশমিত করে বলে মনে হয় না। সমাজের একটি অংশের স্থায়ী দুর্বলতা তাদের আবহাওয়া জনিত কারণের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে।

তারা এর জন্য আয় হ্রসের ধাক্কার সহজ শিকার এবং তার অভিঘাত সামলাতে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা এই   গোষ্ঠীর দুর্বলতাকেই নির্দেশ করে।

পরিবেশ আন্দোলন ও সমস্যা

বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা ১৯৬২ সালে শুরু হয়েছিল, যখন একজন সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন, নির্বিচারে কীটনাশক কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় ফলে, জনস্বাস্থ্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ করেন। ১৯৭০ সালে পৃথিবীতে সকল প্রাণ রক্ষার জন্য ধরিত্রী দিবস উদযাপনের আহ্বান। পরে ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ সংস্থা গঠনের মাধ্যমে এটি গতি পায়। এই ধরনের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ায়, উন্নত দেশগুলো থেকে কম উন্নত দেশগুলোতে বিষাক্ত ও নোংরা পণ্য উৎপাদন স্থানান্তর করা শুরু হয়। ধীরে ধীরে, এই কার্যকলাপগুলো জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ চুক্তি তৈরি করার জন্য ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC)-কে রূপ দেয়। যা পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কয়েকটি নির্দেশিকা প্রস্তাব করে দেশগুলোকে। কিন্তু, এই ধরনের top-down নির্দেশিকাগুলোর সীমিত সাফল্যের কারণে, ১৯৮৭ সালের মন্ট্রিল প্রোটোকল (Montreal Protocal) একটি সাধারণ ঐকমত্য গঠনের জন্য একটি নিম্ন-স্তরের পদ্ধতির (bottom-up approach) প্রস্তাব দেয়। তারও সাফল্য তেমন পাওয়া গেল না, দেশগুলো তেমন গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে, ১৯৯২ সালে ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক উদ্যোগটি নেওয়া হয়, যেখানে গ্রিনপিস, ডব্লিউডব্লিউএফ, অক্সফাম এবং ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ-এর মতো সংস্থাগুলো সদস্যপদ গ্রহণ করে। এর ফলে ১৯৯২ সালে কোপেনহেগেনে (Copenhagen) প্রথম বৃহৎ পরিসরে ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানও ঐকমত্যের অভাবে পরিবেশগত বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিস্তৃত চুক্তি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। পরে, UNFCCC-এর ১৯৯৭ সালের Kyoto Protocol দেশগুলোর জন্য বায়ু দূষণের জন্য দায়ী গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বাধ্যতামূলক লক্ষ্য নির্ধারণ করে। তাও আবার কোনো আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও শাসন ব্যবস্থার অভাবে খুব কমই বাস্তবায়িত হয়। এরপর ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান এবং কিছু ব্রিটিশ সংস্থা নির্গমন নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নতুন করে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারগুলোকে আরও প্রচেষ্টা ও অর্থবিনিয়োগ করার আহ্বান জানায়। অবশেষে, ২০১৫ সালে প্যারিস অধিবেশনে কিয়োটো প্রোটোকলের চুক্তিপত্র হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য পাঁচটি গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাস করার লক্ষে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আসা যায়। অধিবেশন পরামর্শ দেয়, যদি কোনো দেশ এই গ্যাসগুলোর নির্গমন বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে, তাদের অন্য দেশের সাথে কার্বন নির্গমন বাণিজ্য (carbon emissions trading) করতে হবে, অর্থাৎ যারা নির্ধারিত সীমার নিচে গ্যাস নির্গমন করছে, তাদের থেকে পণ্য কিনতে হবে। কিন্তু সেটির মেয়াদও ২০২০ সালে শেষ হয়ে গেছে। তবে, প্যারিস কনভেনশন অনেক দেশকে ২০৫০ থেকে ২০৭০ সালের মধ্যে শূন্য-কার্বন নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়ে এর প্রযুক্তি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি অদায় করেছে। এর জন্য কনভেনশনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু সবুজ বিনিয়োগের জন্য বৃহৎ পুঁজি মালিকদের বাধ্য না করলে তারা এর জন্য তহবিল দেবে না। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শাসনেরও ব্যবস্থা নেই, নেই দেশগুলির সমন্বয়, ফলে এর সাফল্য একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়েছে। এটা পরিষ্কার যে পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেদের পুঁজিপতিদের পরিবেশ রক্ষায় বাড়তি বিনিয়োগ করাতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক। তাদের মধ্যে বাজার নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বের কারণে মুনাফা নিয়ে এমনিতেই টানাটানি, এই অবস্থায় কেউই নিজের থেকে এগিয়ে এসে এর জন্য পুঁজি ঢালবে না। ফলে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পরিবশ রক্ষায় উদ্যোগের কথাটা নিতান্তই কাগুজে বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন বৈশ্বিক সম্মেলন ও কনভেনশনে যে সব উদ্বেগ ও প্রোটোকল উত্থাপিত হয়েছে, তা বিশ্বের অনেক দেশে কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, এটি স্পষ্ট। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হয়েছে ১৮০টিরও বেশি দেশের মধ্যে। যার লক্ষ্য হলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা এবং ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্ব তাপমাত্রা বদ্ধির হার প্রাক-শিল্প স্তরে বা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (৩.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) নিচে নামিয়ে আনা। এসব উদ্যোগে খানিকটা জল ঢেলেছে মার্কিন রাষ্ট্র কর্তারা। নতুন মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসন আগেই ৪ নভেম্বর, ২০২০-এ প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর, ২১ জানুয়ারি, ২০২১-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন একটি নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষর করেন যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আবারও প্যারিস চুক্তিতে যোগদান

করে। ট্রাম্প জানুয়ারি ২০২৫-এ আবার ক্ষমতায় আসেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও প্যারিস চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরিবেশ রক্ষার থেকেও ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকটের (Global Financial Crisis) পর সাম্প্রতিক সবচেয়ে দীর্ঘায়িত মন্দা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার নিয়ে বেশি চিন্তিত। এই পদক্ষেপ সমস্ত আশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। একইভাবে, অন্যান্য উদীয়মান দেশগুলো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং কাগজে-কলমে শূন্য-কার্বন নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, কার্বন নির্গমন ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলো খুব একটা অনুসরণ করছে না। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯-এর তীব্রতা মানব সমাজকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তাই, প্রশ্ন হল, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়করা কি বিশ্বের জলবায়ু বা পরিবেশের সংকট মোকাবিলা না করে নিজের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি বজায় রাখতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর এখন খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ বেশিরভাগ দেশ দীর্ঘায়িত অর্থনৈতিক মন্দার এই বর্তমান পর্যায় কাটিয়ে উঠতে শিল্পায়নের গতি বাড়ানোর কথা বলছে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটি কেবল উন্নয়নশীল অর্থনীতির নয়, উন্নত বিশ্বেরও। ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকটের (Global Financial Crisis) আগে পশ্চিমের উন্নত অর্থনীতিগুলো যে বৃদ্ধির হার অর্জন করেছিল, তা তারা আর ফেরাতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক দশক ধরে প্রাচ্যের উদীয়মান দেশগুলো অর্থনীতিতে গতি দেখিয়েছিল, কিন্তু সম্প্রতি তারা তীব্র মন্দার শিকার। ১৯৮০-এর দশক থেকে ভারত ও চীনে অর্থনীতি জিডিপির নিরিখে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বৃদ্ধির গতি অতি ধীর। তা অসংখ্য অনিশ্চয়তা ও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত। এমনকি যে সব দেশে অর্থনীতিতে সম্প্রতি আয় বৃদ্ধি হয়েছে, সেখানেও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো জনসংখ্যার একটি সীমিত অংশের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যার ফলে বিশ্বের সকল দেশে আর্থিক অসাম্য তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট আয় এবং সম্পদ বেশিরভাগ অর্থনীতির পাঁচ থেকে দশ শতাংশ উচ্চ আয়ের মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ফলস্বরূপ, আর্থিক অসাম্য দ্রুত বাড়ছে, এবং একটি বিশাল সংখ্যক শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরে কোনোভাবে জীবনযাপন করছে। অর্থনৈতিক মন্দা ও এই সম্পদের মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভবনের সাথে মিলিত হয়ে, সারা বিশ্বে বেকারত্ব বৃদ্ধি ঘটছে ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা বেড়েই চলেছ। বেকার জনতাকে কোনোভাবে জীবন ধারণের জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। নোবেল বিজয়ী জোসেফ স্টিগলিটজ সহ অনেক শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ, তাঁদের সাম্প্রতিক কিছু বই, ‘গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস’ এবং ‘পিপল, পাওয়ার অ্যান্ড প্রফিটস’-এ এই পরিস্থিতিকে পুঁজিবাদের সংকট হিসাবে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন জাতীয় সরকার এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থর রক্ষক আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক) দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন উন্নত ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে রাখে, কিন্তু সংকট কাটিয়ে উঠতে আরও বাজার সংস্কারের সুপারিশ করে চলেছে। সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের মরিয়া হয়ে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে বাড়বে প্রয়োজন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। তাতে, কার্বন নির্গমন এবং পরিবেশগত ধ্বংসের উপাদান আরও বাড়বে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্যই শুধু নয়, মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্যও আরও কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করবে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ক্ষতির সমাধান না করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি কি হতে পারে? এই সংকটের মূলে রয়েছে মুনাফা-চালিত পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক সম্পদের বেপরোয়া শোষণ।

বেসরকারি উৎপাদন, পরিবেশগত শোষণ এবং অর্থনীতি

কার্বন এবং তা সম্পর্কিত উপাদানের নির্গমনই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। বিশ্ব তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে এই নির্গমন কমাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন (ক) জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের (Non-Renewable Resource) ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা, (খ) নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable energy) সম্পদের প্রচেষ্টা এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, এবং (গ) কম কার্বন নিঃসরণকারী সবুজ কৌশল (green techniques) গ্রহণ করা। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, গত কয়েক দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তি ও সম্পদের ব্যবহার বাড়ানোর। কিন্তু এই উদ্যোগগুলো সীমিত সাফল্য এনেছে। সুতরাং, প্রশ্ন হলো কী ভাবে অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা যায় এবং নবায়নযোগ্য সম্পদে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা যায়। সমস্যাটি পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক এবং তার উদ্দেশ্যের মূলে নিহিত। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তত

তিনটি কারণ দায়ী— (ক) ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি এবং মুনাফা বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (খ) নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারের উচ্চ খরচ, এবং (গ) প্রশমন (mitigation) ও অভিযোজনের (adoptation) জন্য ব্যক্তিগত সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 'প্রিজনার্স ডিলেমা' (prisoners' dilemma), যাকে বলা হয় ট্র্যাজেডি অফ দ্য কমন্স (tragedy of the commons)। পুঁজিবাদী সমাজে বাজারে দূষিত পণ্য (dirty goods) অপেক্ষাকৃত সস্তা, ফলে তার চাহিদা ও সরবরাহের কারণে সেগুলোর আদান-প্রদান ঘটে। একজন ব্যক্তি যখন মৌলিক চাহিদা এবং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের জোগাড়ে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হন, তখন তিনি পরিবেশ-বান্ধব (environment friendly) পণ্যের জন্য খরচ করতে পারেন না এবং কম খরচের দূষিত পণ্যের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। ফলে তার চাহিদা তৈরি হয়। এটি কুজনেটসের অনুকল্প (Kuznets hypothesis) নামে পরিচিত। অন্যদিকে, একজন উৎপাদক যে নিজের মুনাফা ছাড়া সামাজিক প্রভাব নিয়ে চিন্তিত নয়, সে পরিচ্ছন্ন পণ্যের জন্য বাড়তি খরচ করতে চাইবে না। এবং দূষিত পণ্য সরবরাহ করতে পিছপা হবে না। দূষিত পণ্যের উৎপাদন খরচ কম। তাই, দূষণ সৃষ্টিকারী পণ্য উৎপাদন ও কেনাবেচা হচ্ছে। এখানে দূষিত পণ্য বলতে বোঝানো হয়েছে, যে পণ্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিঘ্নিত করে অথবা পরিবেশ কলুষিত করে সেগুলোকে। অন্যদিকে পরিবেশ-বান্ধব (environment friendly) পণ্য বলতে যে পণ্য তৈরি করতে পরিবেশ কলুষিত হয় না বা যে পণ্য স্বাস্থ্যের উপর তেমন বিরুপ প্রভাব ফেলে না।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা

এটা স্পষ্ট যে বিশ্বজুড়ে অসমতা ও বেকারত্ব বাড়ছে ও সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধির হার কমেছে। শ্রম শোষণের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা এ সবের জন্য দায়ী। এই ব্যবস্থায়, দরিদ্র মানুষ সস্তায় পাওয়া পণ্য কিনে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, যদিও সেগুলো উৎপাদনে পরিবেশে কার্বনের পরিমান বাড়িয়ে দেয়। উৎপাদকরা এগুলি নিয়ে মাথা ঘামান না, যতক্ষণ তা সরাসরি নিজের ক্ষতি না করে। একটি পুঁজিবাদী সমাজে, শ্রম ও পুঁজিকে উৎপাদনের দুটি প্রধান উপাদান হিসেবে ধরা হয়, এবং এগুলো উৎপাদনকে টিকিয়ে রাখার জন্য একে অপরের পরিপূরক হলেও তাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী (antagonistic)। উৎপাদনের উপকরণের মালিক হওয়ায় পুঁজির মালিক উৎপাদনের মালিকানা পায় ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থনীতিতে দেশের আয়বৃদ্ধি দুটি শক্তি দ্বারা পরিচালিত ও ত্বরান্বিত হয় - পুঁজি সঞ্চয়ের হার (capital accumulation) এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (technological change)। এটি তখনই তারা সহজ ভাবে করতে পারে যখন পুঁজির মালিকরা উৎপাদনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং শ্রমিকদের তাদের অবদান থেকে বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত (surplus) তৈরি করার চেষ্টা করে। যদিও শ্রমিকই উৎপাদনের চালিকা শক্তি, তাদেরকে কৌশলগত বঞ্চনার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী অর্থযন্ত্র চালিত হয়। যেহেতু শ্রমিকদের প্রাপ্ত আয়, যা একটি দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা তৈরি করে, তাই তাদের উপর অতিরিক্ত শোষণ তাদের এবং সামগ্রিকভাবে দেশের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে তা অর্থব্যবস্থার সংকটের পথ প্রশস্ত করে। ফলে শোষিত শ্রমিক বাজারে যে পণ্যের দাম কম জীবন নির্বাহের জন্য তাই কিনতে বাধ্য হয়। অতএব, শ্রমশক্তির উপর পুঁজিবাদী শোষণের এই ধরনের ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে কম খরচের কার্বন-নিবিড় পণ্যের চাহিদা টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী। এমনকি যারা পরিবেশ-বান্ধব পণ্য কিনতে সক্ষম, তাদের ও একটা অংশ নিজের স্বার্থে এবং সামাজিক চেতনার অভাবে সেগুলো কেনে।

অন্যদিকে, উৎপাদনের মালিক তেমন পণ্য তৈরি করতে পছন্দ করে যাতে তার মুনাফা সবচেয়ে বেশি হয়। ফলে, এই তারা এই ধরনের দূষিত পণ্যের (dirty goods) চাহিদা পূরণ করতে বেশি পছন্দ করবে, কারণ এর জন্য সবুজ প্রযুক্তিতে (green technology) বা নবায়নযোগ্য শক্তিতে (Renewable energy) বাড়তি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের বিনিয়োগ তাদের সরাসরি মুনাফা কমিয়ে দেয়। একটি পুঁজিবাদী সমাজে এক উৎপাদন ইউনিটের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সামাজিক বিবেচনাকে উপেক্ষা করে নিজের মুনাফা বাড়ানো। যেহেতু সবুজ বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের খরচ বাড়ে, তাই উৎপাদক এমন আউটপুটের বাজার পছন্দ করবে না, যা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত মুনাফার দাম থেকে আলাদা। সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে এবং মালিক মুনাফার জন্য পণ্যের মূল্য বাজারে বাড়ায়। ফলে পণ্যের চাহিদা কমে ও মালিকের ব্যক্তিগত লাভের পরিমান কমে যায়। অতএব, রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করলে উৎপাদক সবুজ বিনিয়োগ করতে চাইবে না। রাষ্ট্র, পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপাতে আগ্রহী নাও হতে পারে। এমনকি যদি তা চাপানোও হয়, তবে এর প্রয়োগ দুর্বল

হয় এবং উৎপাদকরা ঘুষ দিয়ে তা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে নেয়। তাই, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি যে বাজার নীতি, তা পরিবেশের তোয়াক্কাই করে না।

সম্পদের শোষণ

উৎপাদনের দুটি প্রধান উপাদান (শ্রম এবং পুঁজি) ছাড়াও, আরও এক ধরনের উপাদান বিদ্যমান, যেগুলোকে উৎপাদনের 'উপাদানগত উপকরণ' (material inputs) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে (ক) শক্তি বা energy (যেমন, পেট্রোলিয়াম তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) এবং (খ) কাঁচামাল বা raw materials (যেমন খনির সম্পদ, খনিজ, ভূমি এবং বনজ সম্পদ)। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই উপাদানগত উপকরণগুলির ব্যবহার কেমন ভাবে ও কতটা হয় তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: নবায়নযোগ্য (renewable) এবং অ-নবায়নযোগ্য (non-renewable) সম্পদ। একটি নবায়নযোগ্য সম্পদ হলো এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা সময়ের সাথে সাথে পুনরায় পূরণ করা যায়। স্থায়ীভাবে নিঃশেষ হওয়ার ঝুঁকি ছাড়াই এর ব্যবহার অব্যাহত থাকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর অভাব থাকবে না। নবায়নযোগ্য সম্পদের উদাহরণ হলো সূর্যের আলো, বায়ু, জল, কাঠ, বনজ সম্পদ, ভূ-তাপীয় শক্তি এবং জৈবিক দ্রব্য (biomass)। তবে, এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর বেশিরভাগই নবায়নযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদি সেগুলোকে পুনর্নবীকরণ এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়। যেমন প্রাকৃতিক বন, ভূগর্ভস্থ জল ইত্যাদি। এটি বেশিরভাগ মূল্যবান ধাতুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাতে দেশের সামগ্রিক প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় উদ্যোগপতি এতে খুব একটা উৎসাহ নেয় না।

অন্যদিকে, অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ হলো সেই সম্পদ যা প্রকৃতিতে তৈরি হতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লাগে বলে সেগুলোকে সীমিত (finite) বলে মনে করা হয়। এই সম্পদ তৈরি প্রায় অসম্ভব। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম। একবার একটি অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলে তা আর পাওয়া যায় না এবং পুনরুদ্ধার করা যায় না। এই সম্পদের প্রধান সুবিধা হলো এগুলো খুব বেশি সময়, বিনিয়োগ এবং প্রচেষ্টা ছাড়াই সহজে ব্যবহারযোগ্য করা যায়। তাই, একজন পুঁজিপতি ন্যূনতম খরচে এগুলো ব্যবহার করতে পছন্দ করবেন। এগুলোর ব্যবহারের জন্য পরিকাঠামোর অত্যন্ত চাহিদা, এবং দ্রুত বৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রায়শই তাদের স্থায়িত্ব বিবেচনা না করেই সহজে সেগুলোর ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। স্পষ্টতই, নবায়নযোগ্য সম্পদের চেয়ে এগুলোর পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি। কয়লা এবং তেল পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমনের দ্বারা তাপ তাপমাত্রা বাড়াতে এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ঘোটতে থাকে। যেহেতু উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং সীমিত সম্পদ ক্রমশ দুর্লভ হয়ে ওঠে, নবায়নযোগ্য সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অতএব, অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের দুটি প্রভাব রয়েছে: (ক) এটি ধীরে ধীরে সম্পদ নিঃশেষ করে, যা বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশের ক্ষতি করে, এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সম্পদের সম্ভাব্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। (খ) এটি দূষণকারী পদার্থ নির্গত করে, যা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। ফলে যদি তাপমাত্রা কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এই সকল সম্পদের ব্যাবহার ধীরে ধীরে কমানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

১৮৮০-এর দশকের শেষ দিক থেকে আমরা যে শক্তি ব্যবহার করি তা উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি (non-renewable resource) ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জলবিদ্যুৎ এবং কাঠের মতো নবায়নযোগ্য সম্পদ আরও অনেক দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত এগুলি দুটি প্রধান নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ছিল। তখন থেকে, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্রমশ জৈব-ভর, ভূ-তাপীয় শক্তি, সৌরশক্তি, জল এবং বায়ু সম্পদ থেকে আসছে। শক্তি উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে নবায়নযোগ্য সম্পদ বিশ্বের দেশগুলোর আগ্রহ অনেক বেড়েছে। সফল নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের মুল সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্ভরযোগ্যতা এবং খরচ। নবায়নযোগ্য সম্পদ থেকে প্রাপ্ত শক্তি জীবাশ্ম জ্বালানির সরবরাহের ওপর অনেক কম চাপ সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, নবায়নযোগ্য সম্পদ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশ আন্দোলনের একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বৃহৎ পরিসরে নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহারের সমস্যা হলো এগুলো ব্যয়বহুল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এগুলোকে কীভাবে সবচেয়ে সাশ্রয়ী উপায়ে এবং কতটুকু sustainable করা যায় তা নির্ধারণ করার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। তেমন গবেষণায় পুঁজিপতিরা উৎসাহ দেবে এটা একেবারেই দুরাশা। ফলে, বর্তমানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, কীভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার থেকে নিরুৎসাহিত করা যায় এবং ব্যয়বহুল হলেও মানব সভ্যতার স্বার্থে নবায়নযোগ্য সম্পদের প্রয়োগে উৎসাহিত করা যায়।

পুঁজি এবং শ্রমের উপর নির্ভর বাজার অর্থনীতি কি এগুলোর ব্যবহার বাড়াতে সাহায্য করবে? উত্তর হলো ‘না’। অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার দেওয়া যায় না, কারণ এগুলোর ‘নন-এক্সক্লুডেবল’ (non-excludable)। একজনকে এর মালিকানা দিলে, বাজার নীতি অনুযায়ী সে তা নিজের কব্জায় রাখবে, অন্যদের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা যাবে না বা unsustainable হয়ে যাবে। কিন্তু, এগুলো প্রায়শই বড় ব্যবসায়ী, কর্পোরেশন এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ধরনের সম্পদের সরবরাহের পরিমাণ নির্ভর করে সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণের প্রান্তিক খরচের (marginal costs) উপর। মজার বিষয় হলো, বিকল্প নবায়নযোগ্য উৎসের তুলনায় এই উপকরণগুলোর প্রান্তিক খরচ কম থাকে, যা বাজারে বেশি পরিমাণে সরবরাহ করার পথ তৈরি করে। কম দামের কারণে বেশি পরিমাণে সরবরাহ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তাই ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সম্ভাব্য ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করে। এর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতির খরচ হিসাব করলে সরবরাহের খরচ অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু বেসরকারি সরবরাহকারী সেগুলো হিসাব করে না। এমনকি সরবরাহ সীমিত করার জন্য একটি ভারী কর আরোপ করা হলেও, এই ধরনের একচেটিয়া সরবরাহকারী তা এড়িয়ে যাওয়ার বা ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার উপায় খুঁজে নেয়। অন্যদিকে, ব্যবহারকারী সংস্থা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে সামাজিক খরচ দিতে ইচ্ছুক হবে না। একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানির মালিকরা প্যারিস ঐকমত্যকে উপেক্ষা করে, যা অনুমোদিত সীমার মধ্যে দেশগুলোর জন্য কার্বন কোটার একটি স্পষ্ট চুক্তি প্রস্তাব করেছিল, তা লঙ্ঘন করে চলেছে। অতএব, অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ তাদের কম দামের কারণে উচ্চ পরিমাণে সরবরাহ করা হয় এবং এর ফলে উচ্চ মাত্রায় কার্বন নির্গমন ঘটে। উপরন্তু, এই ধরনের ব্যবস্থা তাদের বিকল্প নবায়নযোগ্য উৎসে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করতে পারে না।

একটি সাধারণ উন্নয়নশীল দেশে, যারা সংগঠিত খাতে কর্মসংস্থান খুঁজে পায় না, তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য অসংগঠিত খাতে ভিড় করে। জনসংখ্যার ৭০-৮০% এরও বেশি মানুষ যারা অর্থের অভাবে পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির সাথে জড়িত থাকে, তারা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আরও বেশি নির্ভর করতে বাধ্য হয়। যদি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন চালিয়ে যায় সীমিত মাত্রায় হলেও পরিবেশগত সমস্যাগুলিতে এরাও অবদান রাখে।

প্রিজনার’স ডিলেমা বা ট্র্যাজেডি অফ দ্য কমন্স

পুঁজিবাদী সমাজে, একই উৎপাদনে নিয়োজিত দুটি উৎপাদন মালিক সামাজিক কারণে খুব কমই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে। একজন বিখ্যাত পরিবেশবিদ, হার্ডিন এটিকে ‘ট্র্যাজেডি অফ দ্য কমন্স’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে সাধারণ উদ্বেগ ও সচেতনতা বাড়লেও, পৃথিবীর সম্পদ চিরকাল থাকবে না জেনেও ব্যাক্তি মালিকানা নির্ভর সংস্থাগুলো দূষণ মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছে, যা এই গ্রহের ক্ষতি করছে। সংস্থা এবং দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং এই পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজনটাই চূড়ান্ত হওয়ায় সামগ্রিক সমন্বয়ের অভাবের কারণে এটি ঘটে। এটি প্রিজনার’স ডিলেমার একটি চমৎকার উদাহরণ, যা ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত সুবিধার মধ্যে একটি স্পষ্ট দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বল্প মেয়াদে দূষণ করে বা পরিবেশের ক্ষতি করে নিজে লাভ করতে পারে, যদিও এটি সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনে। তবুও তারা আশু লাভের দৃষ্টি থেকে ক্ষতি করার পথ বেছে নেয়। এর অর্থ হলো, দেশ বা শিল্পগুলো নির্গমন কমাতে চায় না, কারণ স্বল্প মেয়াদে এটি সস্তা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রনে দীর্ঘমেয়াদী খরচ অনেক বেশি। একটি পুঁজিবাদী সমাজে, কোনো শাসকই এই নানা স্বার্থবাহী পক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং বিশ্বাস জোরদার করতে পারে না।

একইভাবে, যখন দুটি দেশ দূষণ করে এবং বিশ্ব তাপমাত্রা বাড়ায়, তখন তাপমাত্রা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে উভয়েরই কার্বন নির্গমন কমাতে সহযোগিতা বা অভিযোজন কৌশল (adaptation strategies) গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদি তাদের মধ্যে কেবল একজন তা করে, তবে এটি কার্যকর নাও হতে পারে। তখন, সহযোগিতা করা বা না করার বিকল্পগুলো একটি যৌথ সিদ্ধান্তে পরিণত হবে। যদি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধার চেয়ে বেশি হয়, তবে উভয়ই সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেবে। এমন একটা সমাজ যদি থাকত যেখানে পরিবেশ পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় জড়িত সমস্ত দেশ একসাথে কাজ করছে এবং নির্গমন কমানোর চূড়ান্ত লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে, তাতে তারা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার দিক বিচার করলে সর্বদা ভালো অবস্থানে থাকতে পারত। কিন্তু বেশিরভাগ আলোচনা হয় ভেস্তে যায় বা তা কার্যকরী হয় না। কারণ আজকের বিশ্বে শক্তিশালী

সাম্রজ্যবাদী দেশের জন্য স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক সুবিধা বেশি থাকে। সে দেশ শুধু অন্য দেশগুলো করছে কি না তা দেখতে থাকে। তারা অন্যদের পরিবর্তন ও নির্গমন হ্রাস অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবিধানের বোঝা বহন করবে না। ঠিক এই কারণেই, কার্বন কোটার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি বা হওয়া প্রায় অসম্ভব। যখন একটি দেশ চুক্তি থেকে বিচ্যুত হয়, তখন অন্য দেশগুলোও অনুসরণ করে। এটা প্রমাণিত যে পুঁজিপতিদের মধ্যে সামাজিক স্বার্থ বোধের অভাবই ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়নের একমাত্র কারণ।

যদিও নোবেল বিজয়ী এলিনর অস্ট্রম 'ট্র্যাজেডি অফ দ্য কমন্স' তেমন ভাবে মানতে নারাজ। তিনি মনে করেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (local institution) ও তাদের পুরনো সংস্কৃতির (traditional culture) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ব্যক্তি স্বার্থের কম অনুপ্রবেশ সামাজিক সম্পদ টিকে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত বাজার নীতির প্রসারের সাথে সম্পৃক্ত তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ (grift individualism) এই ধরনের অনুশীলন ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তা 'কমন্স'-এর জন্য যে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতির পথ তৈরি করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং উৎপাদনশীলতা

অনেক পণ্ডিত যারা বাজার নীতিতে বিশ্বাসী (প্রধানত নব্য এবং নব্য-সনাতন চিন্তাবিদ হিসাবে পরিচিত) তারা শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ ও শোষণমূলক সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, এবং তাই তারা পুঁজিবাদের সংকটের পূর্বাভাসের সাথে একমত নন। তবে, তারা প্রিজনার'স ডিলেমাকে স্বীকার করেন, কিন্তু এই মতও পোষণ করেন যে যদি রাষ্ট্র বাজারকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে, তবে সমস্যাটি অনেকাংশে সমাধান করা যেতে পারে বা সংকটের সম্ভাবনা থাকে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, একজন মালিক উৎপাদনের জন্য পুঁজি এবং শ্রম উভয়ই নেয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মালিকদের চাপে তাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (অতিরিক্ত একটি উপাদান বা ইনপুট অন্তর্ভুক্তির জন্য যতটা অতিরিক্ত উৎপাদন বা আউটপুট) অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি ধার্য হয় এবং সে পরিমাণ অর্থ শ্রমিককে মজুরি বাবদ দিতে হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বেশি উদ্বৃত্তের আকাঙ্ক্ষায় মালিককে সবসময় সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি করতে হয়, তার মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতাও তারা বাড়াতে উৎসাহিত করে। শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানগুলোকে তাদের মোট অর্থ প্রদানের পরেও যেটা অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে তাকে এই ধরনের দক্ষতা পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি ফল হিসেবে ধরা হয়, যাকে বলা হয় residual surplus বা total factor productivity। সুতরাং, একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা যা উৎপাদনশীলতার উন্নতি ঘটায় এবং আয়বৃদ্ধির গতিশীলতা নিশ্চিত করে। অন্য কথায়, প্রযুক্তি এবং সংগঠনের যে কোনো উন্নতি যা কেবল উপাদানগুলোর প্রান্তিক আয় (অর্থাৎ, শ্রমের জন্য মজুরি এবং পুঁজির জন্য ভাড়া) বাড়ায় না, বরং অবশিষ্ট উদ্বৃত্তও (মজুরি এবং ভাড়ার জন্য অর্থ প্রদানের পরে) বৃদ্ধি করে, তা একটি নির্দিষ্ট হারে আয়বৃদ্ধি বজায় রাখে এবং অর্থনীতিকে সংকট থেকে রক্ষা করে। এই অবশিষ্ট উদ্বৃত্তের পরিবর্তনের হারই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। প্রশ্ন হলো, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিণতি উপেক্ষা করে এবং সংকট এড়িয়ে রাষ্ট্র কি বাজার নীতি ব্যবহার করে আয়বৃদ্ধি হার টিকিয়ে রাখতে পারে? যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি উপাদানগুলোর প্রান্তিক আয় (অর্থাৎ, মজুরি এবং ভাড়া) এবং অবশিষ্ট উভয়কেই হ্রাস করে, তা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ধীর করে দেয় এবং একটি সংকটের দিকে পরিচালিত করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি বৃহৎ পুঁজি মালিকের স্বার্থ বাদ দিয়ে এই কাজটা দেখতে পারে?

একটি তত্ত্ব

একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত যত বেশি হবে, বৃদ্ধির হার তত বেশি হবে। এই হার উপাদান এবং প্রযুক্তির উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, যা 'অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত পরিবর্তন' (residual surplus change) হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শ্রমিক একই কাজ করতে থাকে, তবে সে তার দক্ষতা আরও উন্নত করে, অন্যান্য সহকর্মীর জ্ঞান থেকে শিখে, একই যন্ত্র আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে বা পরিবর্তন করতে পারে। ফলে উৎপাদন বাড়বে। একই যুক্তিতে, যদি উৎপাদন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন নির্গত করে, তবে তা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। শ্রমিকদের দক্ষতা হ্রাস পাবে, উৎপাদন কমবে এবং বৃদ্ধি হার কমে যাবে।

যখন এক মালিক বা (একটি দেশ দূষণ করে এবং অন্যেরা করে না, তখন তা বিশ্ব উষ্ণায়নে কিছুটা অবদান রাখলেও তেমন প্রভাব ফেলা সম্ভব নয়। যদি অনেক দেশ বা মালিক একই ধরনের উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং তাদের প্রত্যেকেই একই পরিমাণে পরিবেশে দূষণ করে, তবে পরিবেশে কার্বনের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এটা একজন

মালিক বা একজন দেশের উপর বিশ্ব দূষণের মাত্রা নির্ভর করে না। যখন সবাই দূষণ করে, মোট নির্গমনের মাত্রা বেড়ে বিশ্ব তাপমাত্রার উপর প্রভাব বাড়িয়ে তোলে, যা আবার পরোক্ষভাবে মূলত বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনিতি এবং শ্রম ও পুঁজির উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে, এবং এর ফলে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত কমে যায়। অন্য কথায়, যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি এই তিনটি উৎসের যে কোনো একটির ক্ষতি করে, তবে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। অতএব, যে উৎপাদন তাপমাত্রা বৃদ্ধির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, তা ভৌত পুঁজি (plant and machinary), বাস্তুতন্ত্র এবং শ্রমের কর্মক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব যোগ করলে, উৎপাদনে বেশ ক্ষতি হয়। প্রমাণ রয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, যদিও তার প্রভাব বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি এটি সত্য হয়, তবে কেবল শ্রম এবং পুঁজির আয় হ্রাস পায় না, বরং অবশিষ্ট উদ্বৃত্তও কমে যায়। উপরন্তু, বিশ্ব উষ্ণায়নের সংবেদনশীলতার পার্থক্য থেকে যায় দেশের পরিস্থিতি ও উন্নয়ন, পেশা, জলবায়ু উপর নির্ভর করে।

পুঁজিবাদের সমস্যা

উপরের দুটো আলচনায় দুই সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মালিক শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা বাড়াতে মত্ত থাকে। ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব গুরুত্ব পায় না। দুই, উৎপাদনের নেতিবাচক প্রভাব যদি কমানো না যায়, পুজির মালিকের উদ্বৃত্ত ও মুনাফা কমতে থাকে। এই দুটি বিষয়কে যদি জোড়া যায়, তাহলে দেখানো যায় যে পুঁজিবাদের সমস্যা আরও দ্রুত হারে বাড়ছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্যা দেখাতে গিয়ে, মার্ক্স যে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus Value) দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় মালিক একটা নির্দিষ্ট হারে শ্রম শোষণ করলে মুনাফার পরিমাণ কমতে থাকে। মার্ক্সের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনে ব্যবহৃত সম্পদ (W) হলো স্থায়ী পুঁজি (constant capital– C), পরিবর্তনশীল পুঁজি (variable capital– V) এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের (surplus value– S) সমষ্টি। স্থায়ী পুঁজি (C)-এর মধ্যে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত। পরিবর্তনশীল পুঁজি (V) শ্রমিকদের তাদের শ্রমের জন্য প্রদত্ত মজুরিকে বোঝায়। আর, উদ্বৃত্ত মূল্য (S)-এর মধ্যে মুনাফা, সুদ এবং খাজনা থাকে। মার্ক্স মনে করতেন যে স্থায়ী পুঁজি হলো পূর্ববর্তী সম্পদের সঞ্চয়। শ্রমশক্তি ব্যবহার না করা হলে এটি কোনো মূল্য উৎপাদন করতে পারে না। সুতরাং, উৎপাদনে উৎপাদিত সমস্ত মূল্য মজুরি (V)-এর আকারে শ্রমিকে হওয়া উচিত। কিন্তু, যেহেতু পুঁজিপতি উৎপাদনের মালিক, তাই মূল্যের একটি অংশ (S) শ্রমিকদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং, অর্থনীতির সম্পদ হলো $W=C+V+S$– এবং অর্থনীতির আয় হলো $Y=V+S$।

এছাড়াও, মার্ক্স দেখান উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হলো $s=S/V$, এবং পুঁজির জৈব গঠন (organic composition of capital) হলো $q=V/C$। যদি মুনাফার হার $r=S/SC+SV$ হিসাবে ধরা হয়, তবে এটিকে $r=s/Sq+1V$ হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। এর অর্থ হলো, মুনাফার হার উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক, কিন্তু পুঁজির জৈব গঠনের সাথে ব্যস্তানুপাতিক। শ্রম মূল্যের তত্ত্বের (labour theory of value) ভিত্তিতে মার্ক্স মনে করেন যে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার (s) স্থির থাকে। এর মানে হলো পুঁজিপতি মজুরির একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে নেয়। অন্যদিকে, মার্ক্সের মতে, একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে স্থায়ী পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত যুক্ত হওয়ার কারণে এবং এর প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে পুঁজির জৈব গঠন (q) সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে, স্থির ‘s’ এবং ক্রমবর্ধমান ‘q’ থাকায়, মার্ক্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখায়। তাই, তিনি দেখান, পুঁজিপতিরা শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদের সমস্যা ডেকে আনে।

আগের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত হ্রাস পাবে। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ‘s’ হ্রাস পাবে অথবা ‘S’ কমবে ‘V’-এর তুলনায়। যদি তাই হয়, তবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জলবায়ু পরিবর্তনের উপস্থিতিতে ‘r’ আরও দ্রুত হ্রাস পাবে। সুতরাং, বিশ্ব উষ্ণায়ন পুঁজির সংকটে আরও বাড়িয়ে দেবে।

সম্পদের মালিকানা এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের গতিপ্রকৃতি

ক্রমবর্ধমান শিল্প দূষণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বিশ্ব তাপমাত্রা এবং নির্গমনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, যা বাস্তুতন্ত্র, উৎপাদনশীলতা এবং ফলস্বরূপ প্রবৃদ্ধির ক্ষতি করছে মুলত ১৯৮০ সালের পর থেকে। এখন প্রশ্ন হলো যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবের জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে পুঁজিবাদের শুরু থেকেই তা পরিলক্ষিত হয় নি কেন ? পুঁজিবাদের এই সমস্যার কথাটা শুরুতেই আলোচানায় আসেনি কেন ? কারণ, পুঁজিবাদের মধ্যেও ব্যাক্তি মালিকানার গভীরতা ও গতি তার বাঁচার তাগিদে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে শুরুতে

তেমন প্রকাশ না পেলেও সময়ের সাথে প্রকট হতে থাকে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবেশগত প্রভাবের প্রতি পর্যাপ্ত বিবেচনা না করেই মুনাফা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অগ্রাধিকার দেয়। ১৫-১৬ শতকে, শিল্পায়ন পশ্চিম দেশগুলোতে শুরু হয়েছিল। তখন কার্বনের ঘনত্ব বাড়তে শুরু হলেও তুলনামূলকভাবে কম ছিল। সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের ব্যাপকতা উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম থেকে বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রক্রিয়ার কারণে পুঁজিপতিরা শ্রম শোষণ করে এবং এর ফলে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে। পশ্চিমি দেশগুলো তাদের পণ্য বিক্রি করার কাজে বাজারের সংকটের মুখোমুখি হতে শুরু করে। একই সাথে তাদের দেশের কর্মজীবী জনসংখ্যাকে দেশেই কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয় সুযোগও কমতে থাকে। ফলে তারা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাজার খুঁজতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে ১৭-১৮ শতক থেকেই। দেশে দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসা আর ব্যবহার বাড়লেও ঔপনিবেশিক শোষণের কারণে ইউরোপের এই দেশগুলোর বাইরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তেমন বিকাশ প্রথম দিকে ঘটে নি। তাই, শিল্পের উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ও তার থেকে উদ্গত কার্বনের পরিমাণ গুটিকতক দেশগুলোর মধ্যে সীমিত ছিল। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়নের তেমন সমস্যা তখনও আসেনি।

ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে দেখা দেয় ১৯০০ শতকের শুরু থেকেই। উপনিবেশগুলোর জাতীয় পুঁজি শক্তি অর্জন করতে থাকে। তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বাজার দখলের লড়াই তীব্র হতে থাকে। সংকট এতটাই তীব্র হয় যে উপনিবেশবাদ তার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, যা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এরপরও সংকট চলতে থাকে এবং ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দা, এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। তখনও পর্যন্ত, দেশে দেশে পুঁজিবাদের তেমন ব্যাপকতা আসেনি। বিশ্বের বহু দেশগুলোতে কৃষিকাজে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে, পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোর পুঁজি একচেটিয়া স্তরে আসার পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তার কিছুদিন পরে যে বাজার সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল তাতে উৎপাদনের পরিমাণ কমে গেল আর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সীমিতই রইল।

এসবের সমান্তরালে, বাজার সঙ্কট ও অস্থিরতা মানুষকে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজতে উৎসাহিত করে এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের জন্ম দেয়, যা ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সামাজিক সমতা এবং মানব সমাজের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে এমন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল। রাশিয়ার বুকে সমাজতন্ত্র সফল হয়। এর ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন উৎসাহ পেতে শুরু করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একে একে উপনিবেশগুলো স্বাধীন হতে থাকে। পশ্চিমের দেশের মতো বেশির ভাগ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদের পথেই পরিচালিত হতে থাকে। ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে লাগল। যতদিন বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক মুখ বজায় ছিল। দেশের সম্পদের ব্যবহার কিছুটা সামাজিক স্বার্থে পরিকল্পিত হত। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর দেশে দেশে উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের বন্যা বইতে শুরু করে। ১৯৯০ সালের পর থেকেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো (যেমন বিশ্ব ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড ইত্যাদি) অর্থ এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করল। ফলে, এই প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার জন্য, দেশের জীবাশ্ম জ্বালানি ও সামাজিক সম্পদ ব্যবহার শিথিল করা শুরু হলো। তাই, উৎপাদনের মালিকানার শুধু বেসরকারিকরণ হয় নি, হয়েছে উৎপাদনের উপাদান, প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার চালিকাশক্তির উপরেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমেছে। সেই সময় থেকে কার্বনের ঘনত্বের মাত্রা ভয়াবহ হারে বাড়তে শুরু করে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ আয় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য বাজার নীতির উপর নির্ভরশীল বেসরকারিকরণের কৌশল অনুসরণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আর্থিক সংস্কারের পরামর্শ দিয়ে চলেছে। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং পুঁজির প্রবাহকে ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ। বিশ্বায়নের সময়ে এসে লাগামহীন বেসরকারিকরণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে কিছুটা অবদান রাখলেও পরিবেশের উপর পড়েছে মারাত্মক প্রভাব। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কার্বন নির্গমন। তার ফলে ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

উৎপাদনের উপদান ও চালিকা শক্তি মুলত হলো জঙ্গল (forest), সাধারণ সামাজিক জমি (common land), কয়লা ও তেল (coal and petrolim oil mines) ইত্যাদি। এগুলোর ও ধীরে ধীরে মালিকানার ধরন পরিবর্তন এবং উদারীকরণ ও

বেসরকারিকরণ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর আগে, নদী, বন, মৎস্যক্ষেত্র ইত্যাদির মতো সাধারণ সম্পদ প্রায়শই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত মালিকানায় ছিল এবং ঐতিহ্যগত নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হতো। শতাব্দীর শুরু থেকে, এই সম্পদগুলোর প্রথমে রাষ্ট্রীয়করণ (nationalisation) এবং পরে বেসরকারিকরণ (privatisation) বৃদ্ধি পায়। অনেক দেশেই সরকারগুলো সাধারণ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সম্পদগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা। যেমন, বনাঞ্চল বা জলাশয়ের ওপর সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে কিছু ক্ষেত্রে, সাধারণ সম্পদগুলো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর ফলে, ঐতিহ্যগতভাবে যারা এই সম্পদগুলো ব্যবহার করত, তাদের অধিকার সীমিত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মৎস্য আহরণের লাইসেন্স ব্যবস্থা বা বন থেকে কাঠ সংগ্রহের অধিকার ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ইত্যাদি অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের মালিকানা কাঠামোতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, উপনিবেশিক শক্তিগুলো এবং শক্তিশালী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বজুড়ে অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা এই সম্পদগুলো উত্তোলন করে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের স্বাধীনতার অংশ হিসেবে এই সম্পদের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা বিদেশি কোম্পানিগুলোর সম্পদ জাতীয়করণ করে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি গঠন করে। একদিকে জনগণের জাতীয়তা বোধ তাদের এই কাজ করতে বাধ্য করে একই সাথে, এর লক্ষ্য ছিল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধা জাতীয় পুঁজির জন্য পাইয়ে দেওয়া। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ তাদের তেলের সম্পদ জাতীয়করণ করে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এসে বিশ্ব অর্থনীতিতে মুক্তবাজারের প্রভাব বাড়ায়, অনেক দেশে অ-নবায়নযোগ্য সম্পদগুলোর মালিকানা আবার বেসরকারি খাতে ফিরে আসে। তবে, দেশে দেশে পরিবেশ আন্দোলন, শ্রমিকদের বহুআন্দোলনের ফলে এই সম্পদগুলোর উৎপাদন ও বণ্টনে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ (যেমন, পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন) কিছুটা অন্তত খাতায় কলমে বৃদ্ধি পায়।

১৯৮০-৯০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর চাপে অনেক উন্নয়নশীল দেশ জল, বন এবং চারণভূমিকে বেসরকারীকরণ করে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বলিভিয়ার কোচাবাম্বা-তে ২০০০ সালে সংঘটিত ‘জল যুদ্ধ’ (Cochabamba "Water War") এবং আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য ঘটনা। ১৯৯৫ সালের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর ট্রিপস (TRIPS) চুক্তি অনুযায়ী জৈবিক সম্পদগুলোর ওপরও বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার বিস্তৃত হয়। এর ফলে বীজ এবং জিনগত উপাদানগুলো বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়। এই সময়ে বিশ্ব সাধারণ সম্পদগুলোর স্বীকৃতি বৃদ্ধি পায়, যার মধ্যে রয়েছে: মহাসাগর (১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন, UNCLOS) ও আন্টার্কটিকা (১৯৫৯ সালের আন্টার্কটিকা চুক্তি)

অন্যদিকে, তেল কোম্পানিগুলোর (Oil Majors) নিয়ন্ত্রণ করত ‘সেভেন সিস্টার্স’ (Anglo-Persian/BP– Shell–Exxon– Mobil– Chevron– Gulf– Texaco) নামক বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায়। তারা বিশ্বব্যাপী তেল ও গ্যাসের মজুদ নিয়ন্ত্রণ করত। কয়লা খনিগুলো প্রধানত বেসরকারি মালিকানাধীন ছিল এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। উভয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জীবাশ্ম জ্বালানিকে কৌশলগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যা কর্পোরেট-রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করে। উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি এবং সম্পদের উপর জাতিগত অধিকারের দাবির কারণে মালিকানায় পরিবর্তন আসে। ইরান (১৯৫১, মোসাদ্দেগের অধীনে জাতীয়করণ), মেক্সিকো (১৯৩৮, PEMEX), ভেনিজুয়েলা, ইরাক এবং সৌদি আরবের মতো দেশগুলো বিদেশি ছাড়পত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং জাতিয়কারান করে। তারপরে, ১৯৬০ সালে গঠিত ওপেক (Organization of the Petroleum Exporting Countries) জোট তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোকে তাদের মজুদের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সমন্বয় সাধন করে। ১৯৭০ এর দশকের মধ্যে অনেক রাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় তেল কোম্পানি (NOCs) প্রতিষ্ঠা করে, যেমন - সৌদি আরামকো, পিডিভিএসএ (ভেনিজুয়েলা), এনআইওসি (ইরান), ওএনজিসি (ভারত)।

১৯৭৩ সালের তেল সংকটের পর বেশিরভাগ প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ তাদের মজুদ সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করে। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী তেল মজুদের প্রায় ৭৫-৮০% বেসরকারি কর্পোরেশনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের

মালিকানাধীন ছিল। সোভিয়েত-পরবর্তী পর্যায়ে বেসরকারীকরণ শুরু হয়। ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস শিল্পকে বেসরকারীকরণ করা হয়, যা অলগার্ক-মালিকানাধীন বিশাল কোম্পানি তৈরি করে (পরে ২০০০-এর দশকে পুতিনের অধীনে পুনরায় জাতীয়করণ করা হয়)। আইএমএফ/বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির চাপে অনেক উন্নয়নশীল দেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য তাদের জীবাশ্ম জ্বালানি খাত খুলে দেয় (যেমন - আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা)। এর পরেও জাতীয় তেল কোম্পানিগুলো প্রায় ৯০% মজুদ নিয়ন্ত্রণ করত, যখন বেসরকারি কোম্পানিগুলো প্রযুক্তিগতভাবে কঠিন অঞ্চলগুলিতে (গভীর সমুদ্র, আর্কটিক, শেল) মনোযোগ দেয়। এলএনজি এবং অপ্রচলিত তেল (শেল, ট্যার স্যান্ডস) উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি উভয় সংস্থার মালিকানা মিশ্রিত ছিল। এ সকল উদাহরণ থেকে দেখে যায় যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সামাজিক সম্পদ ও fossil fuel থেকে ক্রমশ শিথিল হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং এর ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক ক্ষতির মূল কারণ হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, যা কার্বনের অবাধ নির্গমনকে রুখতে না পারার কারণে এবং অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্রমাগত নিঃশেষকরণের ফলে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও তার অর্থনীতির উপর প্রভাব ১৯৮০ সাল থেকে বেশি করে অনুভূত হয়। লাগামহীন উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ ব্যক্তি মালিকানা শুধু উৎপাদনে বাড়েনি, বেড়েছে সামাজিক সাধারণ সম্পদে ও জীবাশ্ম জ্বালানি সরবরাহে। ফলে বেড়েছে কার্বন নির্গমনের মাত্রা। কার্বনের উপাদান ক্রমাগত নির্গত হওয়ার ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে যা শ্রমিক, পুঁজি এবং বাস্তুতন্ত্রের দক্ষতার ক্ষতি করে এবং উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে হ্রাস করে। এই ক্ষতি স্বল্পোন্নত এবং ক্রান্তীয় দেশগুলোতে, কৃষি-সম্পর্কিত কার্যগুলোতে, এবং দরিদ্র ব্যক্তি ও মহিলাদের মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলে। কারণ, তারা শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল, যা গত কয়েক দশকে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং শূন্য-কার্বন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখায়নি। যদি এটি চলতে থাকে, তবে এই শতাব্দীর শেষে বিশ্ব তাপমাত্রা ৪°C পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২৫% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। বড় প্রশ্নটি রয়ে গেছে; পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের শোষণ বন্ধ করা এবং শূন্য-কার্বন লক্ষ্য অর্জন করা কি সম্ভব? যদি না হয়, তবে বিকল্প কী হবে? যে সমাজ সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটায়, মুনাফার লোভ থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করে তাকে সমাজ অগ্রগতির পরিপূরক করে তোলে সেই সমাজ না এলে কি পরিবেশ বাঁচতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরই মানব সভ্যতার নিয়তি নির্ধারণ করবে। ⊞

References :

Can-i-Cespedes, G., & Castells-Quintana, D. (2016). Dimensions of the current systemic crisis: Capitalism in short circuit? *Progress in Development Studies*, 16(1), 1-23.

Dell, M., Jones, B. F., & Olken, B. A. (2014). What do we learn from the weather? The new climate-economy literature. *Journal of Economic Literature*, 52(3), 740-798.

Hardin, G. (1968), "The Tragedy of the Commons", Science, 1968, 1243-48.

Hsiang, S., & Kopp, R. E. (2018). An economist's guide to climate change science. Journal of Economic Perspectives, 32(4), 3-32.

Kumar, N. and Maiti, D. (2024). Long-run macroeconomic impact of climate change on total factor productivity-evidence from emerging economies. *Structural Change and Economic Dynamics*, 68: 204–223.

Nordhaus, W. (2019). Climate change: The ultimate challenge for economics. *American Economic Review*, 109(6):1991-2014.

Ostrom, E. (2018). Tragedy of the Commons. In The New Palgrave Dictionary of Economics (pp. 13778-13782). Palgrave Macmillan, London.

Ritchie, H., Rosado, P., & Samborska, V. (2024). Climate change. Our World in Data. (https-//ourworldindata.org/climate-change)

Stern, N. (2008). The economics of climate change. *American Economic Review*, 98(2), 1-37.

Tol, R. S. J. (2018). Economic impacts of climate change. *Rev Environ Econ Policy*, 12.

Tetreault, D. (2017). Capitalism versus the Environment. In The Essential Guide to Critical Development Studies (pp. 341-350). Routledge.

Zhang, Y. S2013V. Capitalism and ecological crisis. *Journal of Sustainable Society*, 2(3), 69-73.

প্রাসঙ্গিক কিছু ছোটগল্প ও সময়ের দাবি

অনিন্দিতা জানা

আমাদের জীবনে রোজ রচিত হয় নানা ছোট ছোট গল্প। জীবনের পরতে পরতে থিতিয়ে যাওয়া পলির মতো তা হয়তো হারিয়ে যায় একদিন। ছোট প্রাণ, ছোট কথা, ছোট ছোট দুঃখ ব্যথাগুলো কেবল যুগের পর যুগ বেঁচে থাকে সাহিত্য রসের অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে। লেখকেরা তা বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁদের সৃষ্টিতে জীবন্ত দলিলের মতো ধরা থাকে সমাজের ব্যথা, বিরহ, যন্ত্রনা, আনন্দ, সুখ। সৃষ্ট চরিত্ররা সমাজের কথা বলে। সমস্যায় পথ খোঁজে। পথের সন্ধান দেয়। পাঠক পাঠিকারা সেই অনুভূতির সাথে একাত্ম হন। আয়নায় নিজেদের মুখ দেখেন। সমাজকে, নিজেদের অবস্থানকে চিনতে শেখেন। চরিত্রের ব্যথা কিংবা আনন্দের সাথে বিলীন হতে হতে কখন যেন নিজেদের ভেতরের বন্ধ দরজা জানালাগুলোও খুলে যায়। একঝলক মুক্ত বাতাসের আনাগোনায় পাল্টে যায় নিজেদের জীবন। জীবন সংগ্রামে এভাবে সংগৃহিত হয় চলার রসদ।

একটি সার্থক উপন্যাস একটি সময়কে, একটা যুগকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে। নানা চরিত্রের আনাগোনায়, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সমাবেশ ঘটে তাতে। লেখক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভেতর দিয়ে যুগের সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, আকাঙ্ক্ষা, এমনকি উত্তরণের পথে আলো ফেলতে সমর্থ হন। কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কথা সাহিত্যের এই প্রকরণ স্বাভাবিক ভাবেই অন্য শিল্পের প্রকরণের মতোই পাল্টেছে বারে বারে। গতিশীল এই সময়ে ছোটগল্প ছোট পরিসরে জীবনের নানা বিশেষ দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এতে ঘটনার ঘনঘটা থাকে না, আবার বিবরণের আতিশয্যও থাকে না। ছোটগল্পের নিটোল বুনন মানুষের মনে সহজে দাগ রেখে যায়। গতিশীল এই জীবনে ছোটগল্পের ভুমিকা তাই অপরিসীম। সাম্প্রতিক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি ছোটগল্প প্রসঙ্গে তাই কিছু কথা।

একটি গল্পের নাম 'সমাজ মাধ্যম'। লেখিকা সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। গল্পের চরিত্ররাও সবাই লেখক। সাতসকালে এক তরুণ লেখকের করুণ পরিণতির কথা মেসেজ করে জানায় লেখক সপ্তর্ষি আর এক প্রতিষ্ঠিত লেখক সুজনকে। তরুণ, সম্ভাবনাময় লেখক অরিন্দম, এদের সন্তানসম। মানসিক অবসাদে ভুগে, শেষ পর্যন্ত জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। খবরটি দেখেই সপ্তর্ষি মেসেজ করে জানায় সুজনকে। সুজন পাল্টা মেসেজে দুঃখপ্রকাশ করে। "কী বলছো তুমি সপ্তর্ষি? অরিন্দম নেই! এ কি সংবাদ শোনালে তুমি আমায়।" মেসেজে এই লেখার পাশাপাশি তিনটে বিস্ময় আর চারটে স্যাড ইমোজিও পাঠায়। সপ্তর্ষি নিজেও এই ঘটনার আকস্মিকতায় মর্মাহত, দুঃখিত। কী এমন ঘটলো! কেনই বা এত অবসাদ! তাই বলে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, মানা যায় না। সুজন অভিজ্ঞ। সান্ত্বনা দেয় সপ্তর্ষিকে। মন শক্ত করতে বলে। বলে, "আমিও কথাটা শোনা ইস্তক নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। ...ঘর অন্ধকার করে একটু শুয়ে থাকতে চাই। আমার ইন্দ্রিয়গুলো কোনও প্রতিক্রিয়া করতে পারছে না। সমস্ত কিছুই বড় বিবশ ঠেকছে সপ্তর্ষি।" এ পর্যন্ত ঘটনা একরকম চলছিলো। এরপর সমাজ মাধ্যমের দৌলতে সুজনের কিছু কমেন্টস সপ্তর্ষির নজরে আসে। কমেন্টগুলো ভালো করে খেয়াল করে। সুজনদাকে যে সময়ে অরিন্দমের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছে সপ্তর্ষি, ঠিক তার পরে-পরেই কোনও এক লেখিকার পোস্টে কমেন্ট করেছে, "...ওই জন্যই আপনাকে ইদানিং হট দেখায়।" ভিন্ন ভিন্ন পোস্টে সুজনদার পর-পর কতগুলো এরকমই চটুল কমেন্ট দেখে সপ্তর্ষি অবাক হয়। মেলাতে পারে না। যে সুজনদা অরিন্দমের মৃত্যুসংবাদে বিবশ মন নিয়ে ঘর অন্ধকার করে একটু শান্তির খোঁজ করছিলেন, এই কি সেই!

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথা আছে, 'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না। আঘাত পাই মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।' ঠিক সেরকমই আঘাত পেলো যেন সপ্তর্ষি। মানুষের জন্য মানুষের শোক, তাপ, অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী, বুদ্বুদের মতো? সবচেয়ে বড় কথা, যাঁরা সাহিত্যিক, মানুষের মন নিয়ে যাঁদের কারবার, সমাজ নিয়ে যাদের ভাবনা, তাঁদের সমাজের প্রতি দায় কতটুকু? জীবনকে ঘিরে কী দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে যাচ্ছেন? সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যই বা কী? তাঁর অনুভূতিশীল মনে যে চেতনা ধরা দিল, তা কি কেবল নিজের স্তুতি, নিজের প্রশংসা আর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য? তাহলে তো সে লেখনি নিষ্ফলা, বন্ধ্যা হতে বাধ্য। মানুষের জীবনের গভীরে, সমাজ প্রগতির

স্বার্থে তার কার্যকারিতা কতটুকু! ‘সমাজ মাধ্যম’ গল্পটির মাধ্যমে এই বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। বাস্তবে আমরা জানি, কালজয়ী সাহিত্যের রচয়িতারা নিজেদের জীবনে বড় মনের পরিচয় রেখেছেন যুগে যুগে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, নজরুল প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্য শুধু কালজয়ী নয়, জীবন সংগ্রামে এঁরা অনুস্মরণীয়, বরেণ্য।

আরেকটি গল্প, অজিতেশ নাগ-এর ‘অষ্টমীর বাড়ি’। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে চাকরি নিয়ে কোয়ার্টারে নতুন সংসার পেতেছে এক সদ্য বিবাহিত তরুণ সরকারি কর্মচারী। এখানে আসার কিছুদিন পর জীবনে নতুন সম্ভাবনাও দেখা দিল। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। অনিবার্য ভাবে প্রয়োজন পড়লো এক কাজের মেয়ের। অষ্টমী নিয়োগ হলো এই সূত্রে। বাসনপত্র, ঘরদোর, সবকিছুকে ঝকঝকে করে গুছিয়ে, ধুয়ে, মুছে পরিচ্ছন্ন রাখায় জুড়ি নেই অষ্টমীর। তার হাতের ছোঁয়ায় ফুলের টব আর ফুলদানিতে ঘরের ব্যালকনি থেকে বেডরুম নতুনভাবে সজ্জিত হয়। তার গোছগাছ করার রীতি দেখে কোনও অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে বলেই মনে হয়। যাই হোক, অষ্টমী বারোখানা বাড়িতে ঠিকে কাজে মাসের শেষে সর্ব সাকুল্যে পায় চোদ্দ-পনেরশো। বারোখানা বাড়িতে কাজ করেও সে বাড়ি ফিরে সন্তান, অসুস্থ স্বামীকে দেখভাল করে। যে এত পরিপাটি, তার বাড়িটি ঠিক কেমন? নিশ্চয়ই ছিমছাম এক কামরা, সামনে এক চিলতে নিকানো উঠোন, তুলসি মঞ্চ, থরে থরে পাট করে রাখা জামাকাপড় ইত্যাদির একটি পরিচ্ছন্ন কল্পচিত্র ভেসে ওঠে তরুণটির মনে। তারপর জানা যায় অষ্টমীর নিজস্ব কোনও বাড়ি নেই। তারা ভাড়া বাড়িতে থাকে। সে ভাড়া বাড়ি কেমন তারও একটা মোটামুটি স্পষ্ট রূপ মনে মনে এঁকে নেয়। একদিন জানা গেল অষ্টমীরা আবার বাড়ি পাল্টেছে। এবারে একেবারে সম্ভ্রান্ত কলোনি, যেখানে ভাড়াই হবে আন্দাজ মাসে হাজারখানেক টাকা। তারপরেই যে প্রশ্নটা মনে আসে, এত টাকা পায় কোথায়? নিশ্চয়ই কোনও অসদুপায় আছে। মনের ভেতর এমন সন্দেহও তৈরি হয়, এত ছিমছাম, করিতকর্মা, ভালো মানুষীর আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই তো? বলা যায় না। অথচ অষ্টমীকে ছাড়া অচল। একদিন মনের ভেতর এই প্রশ্নের উত্তর পেতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে বৈকালিক ভ্রমণে বেরোয়। উদ্দেশ্য অষ্টমীর তত্ত্ব-তালাশ। যে পাড়ায় অষ্টমী উঠেছে, সে পাড়ায় গিয়ে অবশেষে দেখা মেলে অষ্টমীর। একটি নির্মীয়মান ফ্ল্যাট বাড়ি, যার দরজা জানালা এখনো বসেনি, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অষ্টমীকে। জানা যায় সেটাই তার বর্তমান আস্তানা। আরো জানা যায়, যেখানে যেখানে এরকম বাড়ি তৈরি হয়, সেখানে বাড়ির মাল মশলা পাহারা দেওয়ার জন্য লোক লাগে। অষ্টমীদের ঠিকানা তাই পাল্টে পাল্টে যায়। কচুরিপানার মতো ভাসমান জীবন অষ্টমীদের। শ্রমই যাদের একমাত্র সম্বল। সমাজের উৎপাদনের সাথে তাদের নিবিড় যোগাযোগ ও অবদান থাকলেও আয় উপায় সে ভাবে হয় না। পরিশ্রম যা করে তার মূল্য তার কাছে আসে না। সামাজিক এই ব্যবস্থায় ক্রমশ সব হারিয়ে এদের শেকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু। সমাজের ঘূর্ণাবর্তে যে কোনও সময় একেবারে হারিয়ে যায় এরা। আবার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত আপাত সুখি জীবন দোদুল্যমান। দ্বিধা, সংশয়, অবিশ্বাসের দোলাচলে ঠোক্কর খেতে খেতে তাদের জীবনও বয়ে চলে।

‘ভুবনজিতের জুতো’ গল্পটির লেখিকা অন্বেষা রায়। খানিকটা সায়েন্স ফিকশনের আদল আছে গল্পে এবং তার মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার এক নিদারুণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। গল্পে ভুবনজিতের একটাই স্বপ্ন, সে পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে চায়। খানিকটা স্বপ্নালু আর প্রকৃতি প্রেমিক ভুবন। ছায়ানদী গ্রামে, নদীর জলে পা ডুবিয়ে ভাবে তার যদি একজোড়া ভালো জুতো থাকতো, তাই পায়ে দিয়ে, হেঁটে হেঁটেই সে পৃথিবীটা চষে দিতে পারতো। ভালো একজোড়া জুতো কিনবার জন্য টাকা জমায়। মনের ইচ্ছে সব থেকে দামী জুতো কিনবে সে। শপিং মলে যায়। অবাক হয়ে দেখে, মলের স্ক্রিনে দারুন একজোড়া জুতোর ছবি। সেই জুতো পাওয়ার জন্য থিকথিকে ভীড়। কিন্তু যার পায়ে জুতোটা মাপসই হবে, সে হবে ওই জুতোর মালিক, বিনামূল্যে! আশ্চর্য, সিন্ডারেলার মতো ভুবনের পায়েই খাপে খাপে মিলে যায় জুতো! জুতোর পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ, যাঁর দুটো পা-ই কাটা গেছে কোনও কারণে। তিনি জানান, একসময় তিনি এই জুতোটি পরতেন। তাঁর কোম্পানিই এই বিস্ময়কর জুতোটির আবিষ্কারক। যা কিনা অত্যাধুনিক। গোটা পৃথিবীর ম্যাপিং করা আছে এতে। ভৌগোলিক গঠন, আবহাওয়া, ইতিহাস সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। এমনকি নোট নেওয়া, ফটো তোলা, ভিডিও করা, ফোন সবই করা যাবে। আবার কখন খাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া, ঘোরা ইত্যাদি সব অ্যালার্ম বাজিয়ে মনে করিয়ে দেবে ওই জুতো। পা কাটা যাওয়ার পূর্বে ওই বৃদ্ধ এই জুতো পরে পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই জুতো পরে ভুবনজিতের জীবনই বদলে গেল। ভুবনজিত ঘুরে বেড়ায়, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে। কখনো পাহাড় তো কখনো সমুদ্র।

এ যেন ভুতের রাজার বরে পাওয়া জুতো জোড়া। প্রথম প্রথম বেশ কাটলেও কিছুদিন পর এরকম যাপন ক্লান্তিকর ও একঘেঁয়ে লাগলো ভুবনজিতের। নিজের মতো করে থাকা যায় না। যখন তখন অ্যালার্ম বেজে ওঠে নির্দিষ্ট কাজের জন্য। জুতোকে আপডেট করে কথা বলানো, পায়ে জলের স্পর্শ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো, একবার পায়ে গলালে এই জুতোকে আর খুলে ফেলা যায় না। মন চাইলে ছায়ানদীর কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু দেশ বিদেশ ঘোরার পরেও এখন ভুবনজিতের যে ছায়ানদীর জন্য বড্ড মন কেমন করে! কিন্তু উপায় নেই। এই জুতোর ম্যাপে তো ছায়ানদী নেই। কিন্তু ছায়ানদী ভুবনজিতকে যে দুহাত বাড়িয়ে আকুল হয়ে ডাকছে। প্রয়োজনে পা দুটো খুইয়ে, জুতোর বিড়ম্বনাকে জীবন থেকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে সে যেতে চায় ছায়ানদীতে। মরিয়া হয়ে ওঠে ভুবনজিত। অবশেষে একদিন সত্যিই পা খুইয়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে পৌঁছে যায় তার প্রিয় জায়গায়। সর্বাধুনিক যন্ত্র পরিচালকদের মালিকানায় অসহায় মানুষ। আধুনিক দুনিয়ার দাস সে। তার শ্রম, তার ভালোলাগা, ভালোবাসা এই ‘সব পেয়েছির দুনিয়া’য় বিকিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত মানুষের সমস্ত অনুভূতি মরে যায় না। সে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। এখান থেকে মুক্তি পেতে গেলে রক্তপাত অনিবার্য। শেষপর্যন্ত তাই-ই ঘটে। ঘটাতে হয়। ভোগবাদী এই দুনিয়ায় যন্ত্র মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে এ কথা সত্য, আবার আধুনিক এই সভ্যতার দাস হয়ে পড়েছে সে। তাই পায়ের মতো অঙ্গ বাদ দেওয়ার রিস্ক নিয়েই ভুবনজিত এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। জীবনের প্রান্তে একটা হুইলচেয়ার জোটানোর সাধ্য না থাকলেও, শরীরকে ঘষটে, টেনে ছায়ানদীর তীরে যাওয়ার আকুল সাধ পূরণের চেষ্টা তাকে চালিয়ে যেতে হয়। কারণ ওখানেই আছে তার প্রকৃত মুক্তির আনন্দ।

আবার ভোগবাদী এই দুনিয়া যে কত আমি-সর্বস্ব, স্বার্থপর, অমানবিক, নিজের চাওয়া পাওয়া, নাম যশ প্রতিষ্ঠার মোহে মানুষ নিজের বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তানের প্রতি কর্তব্য করতেও ভুলে যায়। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ‘ফেলবেন না’ গল্পটি মানবিক মূল্যবোধের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। গল্পের মূল চরিত্র পাঁচু। সে তার ভ্যানরিকশা নিয়ে পাড়ার অলিতে গলিতে হাঁক পাড়ে ‘ফেলবেন না, ফেলবেন না’ বলে। আসলে এভাবে গৃহকর্ত্রী, গৃহকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাড়ির পুরনো, অকেজো, বোঝা হয়ে পড়ে থাকা জিনিস স্বল্প মূল্যে কিনে সুবিধামত একটু বেশি দামে কোথাও বিক্রি করে দু’পয়সা কামায়। একদিন এভাবে বেরিয়ে সে একটা পুরনো হারমোনিয়াম মাত্র দেড়শো টাকায় কিনে ফেলে। পুরনো হলে কি হবে, হারমোনিয়ামটা জার্মান রিডের ও স্কেল চেঞ্জার। এক সমঝদার হারমোনিয়াম দোকানদার পাঁচুকে নগদ করকরে হাজার টাকা দিয়ে সেটা কিনে নেয়। এক লপতে ভালো মতো লাভ পেয়ে পাঁচুর আরো লাভের ঝোঁক চাপে। আবার একটা মওকা জুটে যায়। পকেটে লাভের সাড়ে আটশো টাকা দিয়ে একেবারে সেগুন কাঠের বাঘ নখ নকশা করা সাবেকি আমলের খাটই কিনে ফেলে। এবার ভাবনার গতি খানিক পাল্টায়। নিজেদের অভাবের সংসারে মেঝের বিছানায় শোয়াই গতি। স্ত্রীর হাসিমুখের কথা মনে পড়ে। ভবিষ্যতে সন্তানদের ছবিও চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তাই এবার খাট বিক্রি করে লাভ নয়। নিজেই ব্যবহার করবে সে এই খাট। কিন্তু এরপর আরও নেশা চেপে যায় পাঁচুর। আজ তার বরাত ভালো। কপাল ঠুকে ফিরতি পথে আরো কয়েকটা বাড়ি টুঁ মারার ধান্দা করে। এই পথেই দেখা হয়ে যায় নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ নৃপেনবাবুর সাথে। পাড়ায় বেশ কয়েকদিন অন্তর অন্তর পাঁচুকে ভ্যানরিকশা সমেত এভাবে পাড়ায় দেখতে পান নৃপেন বাবু। মায়া আর সারল্যে ভরা এমন একটি মুখকে যেন তিনি তাঁর এই নিঃসঙ্গ জীবনে খুঁজে চলেছেন। তিনি পাঁচুকে ডাকেন। ফেলে দেওয়া জিনিস হিসেবে তিনি তাঁর আস্ত বাড়িটাই পাঁচুকে বিক্রি করতে চান। পাঁচু অবাক! বিশ্বাস হয় না তার। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পাঁচুর মনে আসা প্রশ্নগুলো করে ফেলে নৃপেন বাবুর কাছে। এই বাড়ির কোনও উত্তরাধিকার আছে কি? নৃপেন বাবুর স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদির খবর জানতে চায় পাঁচু। জানা যায় ওনার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে অনেক দিন আগেই। ছেলে বিদেশে থাকে। প্রচুর টাকা মাইনে পায়। সেখানেই সেট্‌ল করেছে। বাবাকে দেখে না। এই বাড়ি, বাড়ির আসবাব তাদের কাছে আবর্জনার মতো। নৃপেন বাবু পাঁচুকে তাঁর এই বাড়িটি দিয়ে পাঁচুর কাছেই থাকতে চান। ছোটবেলা থেকে বাবা মা হারিয়েছে পাঁচু। অভাবের সংসারে দুঃখ, কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে সে। গল্পের শেষ দৃশ্যটি সবচেয়ে মূল্যবান। ঠকাস করে বুড়োর পা ছুঁয়ে পেন্নাম করে পাঁচু বলে, “তোমার বাড়ি তোমারই থাকবে। আমি শুধু যেটা ফেলে দিচ্ছিলে সেটাই নেবো।”

বুড়ো ভুরু কুঁচকে জানতে চান, “কী সেটা?”

“ওই যে ছেলের প্রতি তোমার স্নেহ আর ভালোবাসা।” নৃপেন বাবু হাত বাড়িয়ে পাঁচুর চুল ঘেঁটে দেন। ঝাপসা চোখে পাঁচু ভাবে, ফেলে দেওয়া খাট, কিংবা বাড়ি তো অনেকেই পেতে পারে, কিন্তু সে কারো ফেলে দেওয়া বাপ পেল, তাও বিনা পয়সায়, সে কি কম ভাগ্যের কথা!

এই 'ফেলবেন না' গল্পে পাঁচু চরিত্রটি নিতান্ত সাদামাটা। বিশেষ পড়াশুনা নেই হয়তো। সহায় সম্বলহীন খেটে খাওয়া মানুষ। অন্য আর পাঁচটা মানুষের মতোই সে স্ত্রী, সন্তান নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই অতি সাধারণ মানুষটির মাঝে মানবিকতার, উদার হৃদয়, মূল্যবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা এই হৃদয়হীন সমাজে মূল্যবান। অন্ধকারের মাঝে জোনাকির আলোর মতো। আবার নৃপেন বাবুর মতো অনেক বৃদ্ধ বাবা-মা'রা আজ এমনি অসহায়। আধুনিক এই সভ্য সমাজে তাই গড়ে উঠেছে বৃদ্ধাশ্রম। স্টেশন চত্বরে কিংবা রাস্তার অলিতে গলিতেও এইরকম বাবা মায়েদের একটু খোঁজ করলেই সন্ধান মেলে। হাত পেতে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন। বাড়ি থেকে বিতাড়িত কিংবা রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে কৃতি সন্তানেরা। এরকমও তো ঘটনা আছে, এই দেশের সম্পত্তি যা ছিল বিক্রি করে, টাকা পয়সা নিয়ে, বাবা মা'কে বিদেশে নিজের কাছে রাখবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে এয়ারপোর্টে বসিয়ে রেখেছে তাদের। অনেকক্ষণ ছেলের কোনও খোঁজ না পেয়ে তাঁরা জানতে পারেন, ছেলের উড়ান অনেকক্ষণই রওনা হয়ে গিয়েছে এ দেশের মাটি ছেড়ে। নিজের সন্তান! তাঁদের আত্মজ! তাদের সর্বস্ব লুঠ করে, ভিখিরি করে, রাস্তায় ফেলে পালিয়েছে। এর চেয়ে লজ্জার, এ সমাজের কাছে আর কী আছে? নির্মম, নিষ্ঠুর এই সমাজে 'পাঁচু'রাই ভরসাস্থল।

আরেকটি ছোটগল্প 'একাকুম্ভ', লেখিকা কাকলি ঘোষ। লাভভিত্তিক এই সমাজ ব্যবস্থা। মুনাফাখোরদের লালসার কাছে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্বের কোনও মর্যাদা বা কানাকড়ি দাম নেই আজ। এলাকায় এলাকায় প্রোমোটার-রাজ। তাদের দাপটের হুঙ্কার। ঝুনঝুনওয়ালার মতো প্রোমোটারদের বিপরীতে ব্রতীন মাস্টার একমাত্র দৃঢ় প্রতিবাদী স্বর, তিনিই 'একাকুম্ভ'। জমি-হাঙর আর তাদের দালালদের চাপে পাড়ার বোস, সান্যাল, ঘোষরা মাথা নত করেছে। একে একে সবাই সুবিধামত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, তো কেউ রাতারাতি জলা জায়গা বেআইনী জেনেও বুজিয়ে ফেলছে। ঘোষেদের চমৎকার টলটলে জলের পুকুর যা নাকি পাড়ার মাছের উৎস ছিলো, তাও রাতারাতি বুজে যায়। পাড়া কালচারের জায়গায় ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফ্ল্যাট কালচার। ব্রতীন মাস্টারের চোখের সামনেই একে একে সব যায়। শুধু ব্রতীন মাস্টার আর প্রাইমারি স্কুল বাড়িটা ছাড়া। এলাকার একমাত্র প্রাইমারি স্কুল ওটা। করোনা-কালে ছাত্র কমেছে। কিন্তু ব্রতীন রোজ স্কুলে যান, যারা আসে যত্ন করে পড়ান, যত্ন করেন স্কুল বাড়িটারও। ঝুনঝুনওয়ালার দালালেরা ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে ব্রতীন মাস্টারের পেছনে। কিছুতেই বাগে আনা যায় না। সাদা ধবধবে পোশাক আর তার চেয়েও তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে দালালের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রতীন বাবুর ছেলে অতনু। মাষ্টার ডিগ্রি, বিএড সব পাশ করেও বেকার। এসএসসি পরীক্ষা হয় না। তাই চাকরিও জোটে না। প্রোমোটারদের শাকরেদ স্বপন জোয়ারদার এবার মোক্ষম চাল দেয়। সাত তাড়াতাড়ি অতনুকে কনস্ট্রাকশন ফার্মের ম্যানেজারের পদে বসিয়ে দেওয়া হয়। স্বপন জোয়ারদার আর তার দলবল আবার আসে ব্রতীন মাস্টারের কাছে। একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে সই করতে বলে। কিছু না, শুধু এই স্কুলে ছাত্র আর আসে না বলে মাস্টারমশাইকে একটা সই করে দিতে হবে। সামান্য কাজ, একটা সই। এই স্কুল এমনিতেই উঠে যাবে। এইসব বাংলা মিডিয়াম স্কুলে আজকাল আর কেউ পড়তে আসে না। ফলে সামান্য এই সই-এর বদলে বরং কিছু ফায়দা হবে উভয়েরই। ব্রতীন মাষ্টার সোজা তাকান স্বপন জোয়ারদার-এর দিকে। স্বপন জোয়ারদার কথায় কথায় একথাও জানায় নির্ভুল ইংরেজিতে এই চিঠিটি লিখে দিয়েছে স্বয়ং ব্রতীনেরই সদ্য চাকরি পাওয়া ছেলে অতনু। রাগে ব্রতীনের সারা শরীর জ্বলে উঠলেও নিজেকে অদ্ভুত শান্ত রাখেন ব্রতীন। বলেন, তিনি সই করতে পারবেন না। জোয়ারদার এরপর আরো মোক্ষম কায়দায় মোটা সাদা খাম বাড়িয়ে দেয়। 'কিছুক্ষণ খামটার দিকে তাকিয়ে উচ্চ স্বরে হেসে ওঠেন ব্রতীন। ভুল করছেন আপনারা। আচ্ছা, আজ তবে আসুন। নমস্কার। স্বপন জোয়ারদার এরপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, সই করবেন না তাহলে? ব্রতীন তার উত্তরে বলেন 'যা বলবার বাংলাতেই তো বললাম। বুঝতে পারছেন না? বাংলা মিডিয়ামের এত দুরবস্থা জোয়ারদার বাবু! মাতৃভাষা যে কারো কাছে এরকম দুর্বোধ্য হতে পারে, টের পাই নি তো আগে! স্পষ্ট করে বলছি যতক্ষণ খাতায় একটি ছেলেরও নাম থাকবে, ততক্ষণ সই করবো না। আপনারা আসতে পারেন এবার। এরপর গল্পের একেবারে শেষে লেখক বলছেন, ব্রতীন মাস্টার জানেন আগামীকাল থেকে তার ছেলের চাকরিটা আর থাকবে না। হয়তো কোনও এক সন্ধ্যায়, নির্জন রাস্তায় ছুরি কিংবা গুলির আঘাতে তাকে রক্তাক্ত হতে হবে। তবু শান্তি পাচ্ছেন ব্রতীন। বেশ শান্তি পাচ্ছেন। তার সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে কেউ কালির দাগ লাগাতে পারেনি। এই গল্পটিও বর্তমান সময়ের আর একটি বাস্তব দিককে তুলে ধরেছে। যা আমরা অনেকেই অহরহ ফেস করে চলেছি। ফ্ল্যাট কালচার যে শহর,

আধাশহরগুলোতে আগ্রাসন চালাচ্ছে, এটা আমরা মর্মে মর্মে টের পাই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর আক্রমণ। পাড়ায় পাড়ায় প্রোমোটার-রাজ, আর এসবের দৌলতে অশিক্ষিত মূর্খদের দাপট সমাজে যে বাড়ছে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে চিত্র অত্যন্ত দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছে।

সময়ের সমস্যা, ছোট ছোট মূল্যবোধ, মধ্যবিত্ত আপাত সুখি জীবনের জটিলতা, আপাত ভালো মনের আড়ালে যে মন থাকে, আধুনিকতার মোড়কে যে চটুল কদর্যতা, হৃদয়হীনতা থাকে, সেসবকে উপেক্ষা করে সত্যিকার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মানবিকতার খোঁজ চলে জীবনের আকাঙ্খায়। ছোট ছোট কাহিনীতে তা পরিস্ফুট হয়েছে এই গল্পগুলোয়। সহজ ভাষা আর সাবলীল উপস্থাপনায় তা পাঠকের মনকে স্পর্শ করেছে। ভারী কথা বা বর্ণনার আতিশয্য নেই। ছোটগল্পের নির্ভার শরীর হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়।

এই গল্পগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়লো কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন সম্ভারের অভাব নেই। ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের কথা বাদ দিলেও আরো অসংখ্য লেখক, লেখিকারা বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ লেখক লেখিকারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্ররা স্তরে স্তরে সাংস্কৃতিক ধারাকে যে জায়গায় উন্নীত করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা আর বেশিদূর এগোয় নি। মানবতার জয়গান গেয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাত ধরে এদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ-এর সাহিত্য চিন্তায় অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদ মিশে থাকলেও মূলত তিনি মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন। মুসলমানীর গল্প, শাস্তি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, পোষ্টমাস্টার, স্ত্রীরপত্র, দেনাপাওনা ইত্যাদি ছোটগল্প জীবনের বিভিন্ন অন্ধকারময় দিকগুলোয় আলো ফেলতে সমর্থ হয়েছে। মানুষের মানবিক গুণাবলির স্ফুরণে ছোটগল্পগুলো অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

এর পরের ধাপ থেকে যেন শুরু করেছেন নজরুল। যদিও নজরুল গল্পকার নন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের যুগে যুদ্ধ, অত্যাচার, শাসন, শোষণে জর্জরিত মানুষের আকাঙ্ক্ষা সার্থক রূপ পেয়েছে। তাঁর সৃষ্টিতে মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসা, প্রেম আবার এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ‘এক হাতে মম বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ তূর্য।’ এই পঙ্কিল সমাজ, যে সমাজ মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়, সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেয়, সেই সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, ‘আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে-যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।’ নিজেকে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে কুলিমজুর কবিতায় প্রশ্ন রেখেছেন, ‘এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?’ শাসকের হাতে শোষিতের এই নিপীড়নমূলক সমাজকে ভাঙার গান, বিপ্লবের জয়গান গেয়েছেন নজরুল।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, ‘শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের প্রথম সারিতে নিয়ে গিয়েছেন।’ তিনি আরো বলেছেন সাহিত্যে ‘তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারও তেমন ঘটেনি’। অর্থাৎ প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ। মানবতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে উপন্যাসে, গল্পে, সর্বহারা সংস্কৃতির যুগের আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে, নানা চরিত্র চিত্রায়নে। দর্শনের গভীর তত্ত্ব, সত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র অর্থাৎ বিপ্লবী চরিত্র কেমন হওয়া উচিত, তা উপন্যাসে, গল্পে রসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের কাছে তাই তাঁর সৃষ্টি ‘সব্যসাচী’ চরিত্র হয়ে উঠেছিল অনুসরণীয়। ‘পথের দাবী’ হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের কাছে ধর্মগ্রন্থের মতো। সে যুগের বিপ্লবীরা তাঁদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সব্যসাচীর মতো হতে চাইতেন। এছাড়া ‘বিন্দুর ছেলে’-তে বিন্দুবাসিনী, ‘রামের সুমতি’-তে রামের বৌদি, ‘মেজদিদি’র মেজদি, ‘পল্লীসমাজে’র বিশ্বেশ্বরী হয়ে উঠেছে অনুসরণীয় মাতৃ চরিত্র। নিজের সন্তানকে সকল মা’ই ভালোবাসে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অপরের সন্তানকেও নিজের সন্তানের অধিক ভালোবাসতে পারার মন, সেই উচ্চতায় নিজেকে স্থাপন করা, সার্বজনীন মাতৃত্বের গুণাবলী এইসব চরিত্রের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, অরক্ষণীয়া, মামলার ফল ইত্যাদি শরৎচন্দ্রের অনন্য সৃষ্টি। সাহিত্যে সংস্কৃতির যে উচ্চ সুর কথা ও রসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন শরৎচন্দ্র, পরবর্তী সময়ে যুগের আকাঙ্ক্ষায় আজ তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী

সময়ে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্ররা একটা চেষ্টা করেছেন। সুবোধ ঘোষের পরশুরামের কুঠার, সুন্দরম, ফসিল, ক্যাকটাস, অলীক প্রভৃতি বেশ কিছু গল্প উল্লেখ করার মতো। ফসিল গল্পটি এর মধ্যে অন্যতম। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের অঞ্জনগড়। সেখানে ভিল, কুর্মি প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর দীর্ঘদিনের জমিদার শাসন প্রায় অস্তগামী হলেও, তাদের অত্যাচারের বহর আছে তেমনি। তার মাঝেই পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটছে। খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে মালিকরা। তারা আদিবাসীদের সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা পাকাপোক্ত করতে চায়। জমিদার আর সিন্ডিকেটদের মধ্যে বিরোধিতা থাকলেও, আদিবাসী মানুষদের শ্রমের বিনিময়ে সৃষ্ট সম্পদকে দিনের পর দিন লুঠ করা কিংবা, সেই নেটিভ মানুষদের মাথা তুলে মানুষ হিসেবে মর্যাদানিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়ার সামান্য প্রশ্নেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সেই একই। আদিবাসীদের নেতা দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে যখন যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই অবিচারের বিরুদ্ধে নেটিভরা প্রতিবাদ শুরু করলো, লড়াই শুরু করলো, জমিদার আর সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা একজোট হয়ে দুলালকে খতম করে ও নির্বিচারে আদিবাসীদেরও খতম করে। আর খনির গর্ভে অসুরক্ষিত অবস্থায় চাপা পড়ে জীবন্ত সমাধি ঘটে অনেকের। আন্দোলন এভাবে দমন করার পর মালিকের এজেন্ট মুখার্জি শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ার মাঝে ভাবতে থাকে ভবিষ্যতে ফসিল হয়ে যাওয়া আদিবাসী শ্রমিকের নিদারুণ নিদর্শন চিত্র। ভাবে এই অবিচারের কোনও সাক্ষ্য পর্যন্ত থাকবে না ভবিষ্যতে। অত্যন্ত দক্ষতায় সুবোধ ঘোষ এঁকেছেন ফসিলের ওই চিত্র। ওখানের মাটির ঘ্রাণ আর জমিদার, সদ্য গজিয়ে ওঠা মালিকদের নিষ্ঠুর খতিয়ান এই ‘ফসিল’! এরকমই নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়-এর ছোটগল্প হিসেবে ‘হাড়’, ‘দোসর’, ‘টোপ’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘হারানের নাতজামাই’, বনফুলের ‘দুধের দাম’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘তারিণী মাঝি’, ইত্যাদি অসাধারণ সব ছোট গল্প, যা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। কন্টেন্ট এবং ফর্মের ওই দক্ষতাকে ছাপিয়ে আজকের সাহিত্য আধুনিক জটিল জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার কথা। অথচ অতীতের কন্টেন্ট এবং ফর্ম উভয়কেই ছাপিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বেশিরভাগ প্রচারিত লেখায় আধুনিকতার নামে রগরগে যৌনতা, ভায়োলেন্স, পরকীয়া, লেসবিয়ানিজম-এর মতো বিকৃত মানসিকতাই ঠাঁই পাচ্ছে। বাস্তবতার নামে এ সবের চর্চা হচ্ছে বেশি। স্বাধীনতার নামে, বাস্তবতার নামে সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতি গুলিয়ে যাচ্ছে। ভোগবাদের এই দুনিয়ায় সাহিত্য সৃষ্টিও হয়ে উঠেছে পণ্য। বাণিজ্যিক স্বার্থ, TRP-এর চক্করে তা দেদার বিকোচ্ছে বিনোদনের নামে। আত্মসুখসর্বস্ব, স্বার্থপর, লম্পটরা যেমন সমাজে ছড়ি ঘোরাচ্ছে, সাহিত্যেও এদের দাপট প্রকট হয়ে উঠছে।

এই পঙ্কিল স্রোতের বিপরীতে যাঁরা জনজীবনের সমস্যার ভেতরে মূল্যবোধের ছবি আঁকছেন বা আঁকতে চাইছেন, সে ধারাস্রোত অতি ক্ষীণ হলেও, তাঁদের এই সংগ্রাম অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য, উল্লেখ করবার মতো। কিন্তু যুগের আকাঙ্খা যে তার চেয়েও বেশি কিছু দাবি করে। দাবি করে শরৎচন্দ্র যেখানে শেষ করেছেন, এ যুগে আরো উন্নত চরিত্র, উন্নত সৃষ্টির পথ বেয়ে নতুন আঙ্গিকের সাহিত্য এই সময়কে পথ দেখাক। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রথমত লেখককে চিনতে হবে এই সমাজটাকে। জানতে হবে সমাজের অর্থনীতি কোন নিয়মে চলে। সেই অর্থনীতিকে ঘিরে একটা সমাজ কোন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার রূপ বা চরিত্রটি আসলে কোন সংস্কৃতির প্রতিফলন। লেখিকা কাকলি ঘোষ, ব্রতীন মাস্টারের মতো চরিত্র চিত্রায়নে সার্থক হলেও ব্রতীন ‘একা কুম্ভ’। নির্জন রাস্তায় অসহায়ের মতো তাঁকে একা একাই রক্তাক্ত হতে হয়। আদর্শের একটা মান নিয়ে সংগ্রাম করার পরও তাঁরা এভাবে একা! কেন? ব্রতীনের এই যে প্রতিবাদী মন, মৃত্যুর ভয় আছে জেনেও যে অন্যায়ের সাথে আপস করে না। সমাজের স্বার্থের প্রতি তার এই দায়বদ্ধতা আজকের দিনে নিঃসন্দেহে মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে গুলি খাওয়া এবং পরাজিত হওয়া ছাড়া তার কাছে আর যেন কোনও রাস্তাই খোলা থাকে না। সততার পথে চলেও এই পথে মর্যাদাবোধসম্পন্ন মধ্যবিত্তের এটাই পরিণতি যে, শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে নিঃসঙ্গ একা কুম্ভ হিসেবেই আবিষ্কার করে। এটাই কি সমাজের সত্যিকারের বাস্তবতা? তা কিন্তু নয়! আসলে এই মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ যেমন মূল্যবোধের জন্য প্রাণ দিতে পারে তেমনি গরিব খেটে খাওয়া অর্ধভুক্ত, শিক্ষায় বঞ্চিত মানুষের সাথেও বিচ্ছিন্ন বোধ করে। আজকের সমাজে যে কোনো অন্যায়কে ঠেকিয়ে দিতে ঐ দলকে দল অধিকারহীন নিজেদের দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিভ্রুক্ষেপহীন অসচেতন জনশক্তির প্রতি তার কোনও শ্রদ্ধা বিশ্বাস বলে কিছু নেই। যেদিন সেই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, সেদিন ব্রতীনকে ‘একা কুম্ভ’ হয়ে থাকতে হবে না। সেই দৃষ্টি পেতে গেলে তার নতুন চোখ চাই।

নতুন মর্যাদাবোধ চাই। বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ দর্শনকে জীবনে ধারণ করা চাই। নতুন আত্মীয়তার সেই বোধ যখন তার চোখে ধরা পড়ে তখনই সে বুঝতে পারে যে, সে একা নয়। তাই এই ‘একা কুম্ভ’ ব্রতীনরা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হয়েই থেকে যান। না পারেন পুরোপুরি আদর্শচ্যুত হতে, না পারেন সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে। স্বাভাবিক নিয়মে পুঁজিবাদ যে সংস্কৃতির জন্ম দেয়, শেষ বিচারে এই গল্প পাঠক মনে সেই হতাশারই জন্ম দেয় না কি? আসলে লেখক এর বেশি ভাবতে পারেন না অথবা চান না। এর বেশি ভাবতে গেলে রাজনীতির প্রশ্ন আসবে। পক্ষ নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। পক্ষ নেওয়াটা তখন জরুরি হয়েই দেখা দেবে। সচেতনভাবেই বেশিরভাগ লেখক বিশেষত তরুণ প্রজন্মের লেখকেরা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়াকে ঠিক মনে করেন না। নিরপেক্ষ থাকতে চান। মনে করেন নিরপেক্ষ থাকতে না জানলে সৃষ্টি করা যায় না। নিরপেক্ষতার সঠিক ধারণাটিও তাঁদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। অথচ শরৎচন্দ্র, নজরুলরা তৎকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। সমাজের ভালো মন্দের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল তাঁদের। জীবনের এই ঝুঁকি নিতে তাঁরা কেউই পিছপা হন নি। এর জন্য হয়তো আঘাত নেমে এসেছে। শাসকের চোখ রাঙানিতে লেখা প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নজরুলকে তো জেলে বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই নজরুলকে আশীর্বাণী পাঠিয়ে তাঁর ‘বসন্ত’ গীতিকাব্য উৎসর্গ করেছিলেন। ‘পথের দাবী’ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শাসকের সে সব আঘাতকে হাসিমুখে উপেক্ষা করেই নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠেছেন তাঁরা। সত্যের পক্ষ নেওয়ার সৌন্দর্যকে জীবনে এ ভাবেই উপভোগ করছেন। এই পথেই অনবদ্য কালজয়ী সৃষ্টিও রচনা হয়েছে। জীবনের সত্যিকার রসে জারিত হয়ে উঠেছে তাঁদের সৃষ্টি। কিন্তু আজকের এই চূড়ান্ত ভোগবাদের সময়ে একদল লেখক নিজেদের ‘সাতে পাঁচে নেই’ বলে সদম্ভে ঘোষণা করেন। রাজনীতি বিমুখ হয়ে, গা বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে, আসলে রাজনীতির দাপটের কাছে আপস করতে করতে বাণিজ্যিক কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের নিছক মেকানিক হয়ে যান। সাহিত্যে তা দুঃখজনক। সাহিত্যিকদের সেটা না হওয়াই কাম্য। নতুন সময়ের, নতুন গল্প বলতে গেলে লেখকদের এই সংগ্রামটা আজ ভীষণ জরুরি। সমাজ, সভ্যতার বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস জানা, ভাষা-সাহিত্যের জগতে ধাপে ধাপে উত্তরণ ঘটেছে কিভাবে তা অনুধাবন করে, ফর্ম ও কন্টেন্টের একাত্মতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে সাহিত্যকে আরো এগিয়ে যেতে হবে, আধুনিক সাহিত্যে এটাই, নিঃসন্দেহে এটাই সময়ের দাবি।

পরিশেষে আবার বলা দরকার, যে সমস্যাগুলো আলোচ্য গল্পের লেখকরা তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গল্পগুলো যথার্থই গল্প হয়ে উঠেছে, সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দিক থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু একটা বিষয় একটু ভেবে দেখা দরকার ব্রতীন মাস্টাররা রুখে দাঁড়াতে চান, ভুবনজিতরা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এই চাওয়া নিয়ে তাঁরা কী করবেন ? কী করতে পারেন ! চাওয়া আর স্বপ্নের যন্ত্রণা নিয়েই কি তাঁরা শেষ হয়ে যাবেন, না কি উত্তরণের ইঙ্গিত অন্তত দিয়ে যাবেন ? সমস্যা, তা দিয়ে নাড়িয়ে দেওয়ার গল্প বাংলা সাহিত্যে কম আসেনি। যতদিন মানবতাবাদের গণ্ডিতে তার যন্ত্রণা জাগানো বোধ সমাজ মননে নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিতে পেরেছে, ততদিন তার সার্থকতা মনে গেঁথে গেছে। ধীরে ধীরে যখন মানবতাবাদ তার সমাজ অগ্রগতির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, বহু সার্থক গল্পও মানুষকে কাঁদিয়েও ওই জল শুকানোর পরেই তার রেশ হারিয়ে ফেলেছে। কোথায়, কতদূর যেতে হবে, পথ চেনার এই আকাঙ্ক্ষা জাগানিয়া গল্পের অপেক্ষায় পাঠক সমাজ। ⌑

“...[illegible]

Space Donated by

A
Well
Wisher

☎ 9433304340
9635822937

রোগী ভর্তি, অপারেশন ও ডেলিভারির জন্য-

নিউ সানভিউ নার্সিংহোম

কুশপাতা :: ঘাটাল :: পশ্চিম মেদিনীপুর
(ঘাটাল-রাণীচক রাস্তায়,
এ.ডি.আই.অফিসের পাশে)

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবা দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যসাথী
Swasthyasathi

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আরএসএস

অনুপা ঘোষ

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় ভাষণে স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএস-এর গৌরব গাথা (!) দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টা নতুন নয়। এর আগেও বহুবার এ চর্চা হয়েছে। মানুষের মধ্যে একটা ধারণা সুকৌশলে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে যে, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আরএসএস নেতাদের ত্যাগ অনন্য। ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সেই চর্চারই অংশ মাত্র। এখন বিষয় হলো, স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবন্ধু, সুভাষ, মতিলাল নেহেরু যখন জাতীয় বীর রূপে জনমানসে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় আরএসএস এই জাতীয় বীরদের বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিল। এখন, তাদের ভাষ্যে, আরএসএস নেতারা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন, দেশের জন্য তাদের ত্যাগ অসামান্য। এই মিথ্যার কারবার, ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলেছে অনেকদিন ধরেই। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে তিনি 'মহান দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, এই স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি দেশ এতদিন যে অবজ্ঞা দেখিয়েছে তা সংশোধন করা হল। তখনকার আরএসএস প্রধান রাজেন্দ্র সিংও সেই অনুষ্ঠানে হেডগেওয়ারকে মহান দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে অভিহিত করেছিলেন। পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এখন বলছেন, 'আমার মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ।' এইভাবে আরএসএসের ভাব মূর্তির নির্মাণের কাজ চলছে সতর্ক দক্ষতায়। ওদের ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকে জনমনে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার তাড়নায় ওরা এই ইতিহাস বিকৃতির পথ বেছে নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট রাজনীতির এটাই চরিত্র। এই ওদের স্বভাব, এই ওদের চরিত্র।

যাই হোক, স্বাধীনতার সংগ্রামে ওদের অংশগ্রহণের প্রমাণ হিসেবে আরএসএস যে সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তার মধ্যে প্রধান হল– ১) কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের দু'বার কারাবরণ। ২) বীর সাভারকারের ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য দ্বীপান্তরে নির্বাসন। এইসব দৃষ্টান্ত তুলে ওরা প্রতি প্রশ্ন হাজির করে— যদি আরএসএস-হিন্দু মহাসভা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে তবে এমন ঘটনা ঘটলো কী ভাবে? স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের স্বপক্ষে ওদের এই ঐতিহাসিক প্রমাণ (!) যে কতটা ভিত্তিহীন, তার বস্তুনিষ্ঠ চর্চা আজ বড় প্রাসঙ্গিক। প্রয়োজন প্রকৃত সত্য উদঘাটন। সেই প্রয়োজন বোধ থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, যখন আমাদের দেশের তরুণেরা ' মুক্তির মন্দির সোপান তলে প্রাণ বলিদান ' দিয়েছে, তখন কী ভূমিকা পালন করেছিল এই আরএসএস?' ভারত মাতা কি জয় 'ধ্বনিতে যারা দেশবন্দনা করছে, তাদের পূর্বসূরীদের অতীত ইতিহাস কী, কী মাতৃবন্দনা তাঁরা অতীতে করেছেন?

প্রথমে আমরা দেখব স্বাধীনতা আন্দোলনে ডাঃ হেডগাওয়ার কী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সত্যিই তাঁর ভূমিকাকে গৌরবজনক বলা যায় কি না।

ডাঃ হেডগেওয়ারের ভূমিকা

এ কথা ঠিক যে, ডক্টর হেডগেওয়ার ব্রিটিশ কারাগারে দু'বার বন্দি ছিলেন। খিলাফত আন্দোলনের এক সভায় (১৯২০--২১) বক্তৃতা দেওয়ায় প্রথমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন আরএসএসের প্রতিষ্ঠা হয়নি। তাই প্রথমবারের গ্রেপ্তার বরণকে কোনওমতেই স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের অংশগ্রহণের প্রমাণ হিসাবে হাজির করা যায় না। কিন্তু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ডাঃ হেডগেওয়ারের মধ্যে যে ধরনের চিন্তার জন্ম হয়েছিল তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর হেডগেওয়ারের তখনকার মানসিকতার বর্ণনা করে আরএসএসের এক প্রকাশনায় বলা হয়েছে: ''দেশে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। ১৯২১-এর আন্দোলনের উত্তর পর্ব ডাঃ হেডগেওয়ারের কাছে আঘাতের মতোই এসেছিল। ভারতীয় মুসলমানরা প্রমাণ করেছেন, তারা প্রথমে মুসলমান পরে ভারতীয়। কারণ তুরস্কের খিলাফতের দাবি ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তারাও ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। মুসলমানদের অন্ধ গোঁড়ামি গোটা দেশের পরিবেশকে ভারী করে দিয়েছিল।'

‘ভারত মাতা কি জয়’ নয়, আল্লা হো আকবর ‘ধ্বনিই চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছিল। শীঘ্রই বান্নু, কোহট, মূলতান, নাগপুর ও অন্যত্র মুসলমানদের দাঙ্গা শুরু হয়। এগুলি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নয়,’ তিনি বলতেন, ‘এগুলি মুসলমানদের দাঙ্গা কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারাই দাঙ্গা শুরু করে এবং আক্রমণ করে।’ এই দাঙ্গার পরিণতিতে শুরু হয় মোপালাদের নৃশংস অত্যাচার... অগ্নিসংযোগ, লুঠ, হত্যা, ধর্ষণ ও জোর করে ধর্মান্তরিত করা। গোটা জাতি হতবাক হয়ে পড়েছিল। ডক্টর জির মনে প্রশ্ন জেগেছিল–– এটা কি খেলাফত (খলিফার পুনর্বাসন) না অখিলাফত (সকলের জন্য বিপর্যয়) ? এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ভারতে হিন্দুরাই জাতি এবং হিন্দুত্বই ‘রাষ্ট্রীয়ত্ব’। বহু অলীক চিন্তাশীল মানুষ জাতির রাজনৈতিক আকাশের লেখাটি পড়তে চাইলেন না। কিন্তু বাস্তববাদী ডাঃ হেডগেওয়ার অলীক স্বপ্ন দেখতে চাননি। সত্য প্রকাশিত হয়েছিল। একমাত্র হিন্দুরাই হিন্দুস্থানকে মুক্ত করতে পারবে, তারাই পারবে হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করতে। একমাত্র হিন্দুদের শক্তিই পারবে দেশকে রক্ষা করতে। ব্যক্তিগত চরিত্র ও মাতৃভূমির প্রতি গভীর আবেগের ভিত্তিতে হিন্দু তরুণদের সংগঠিত করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ স্থাপনের মধ্যেই এই মহাত্মা মানুষটির যন্ত্রণার ভাষা খুঁজে পায়।” এই বর্ণনা থেকে আমরা কী দেখলাম ? দেখলাম, খিলাফত আন্দোলনে কারাবরণ করে ডক্টর হেডগেওয়ারের অন্তরে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা পুষ্ট হয়নি। খিলাফত আন্দোলনের দুর্বলতা তার হৃদয়ে হিন্দু মানসিকতারই শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। পরিণতিতে তিনি বন্ধুদের নিয়ে আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্যাগ করেছিলেন কংগ্রেসের মতো জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্ল্যাটফর্ম। তার এই প্রচেষ্টা যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী না করে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

ডক্টর হেডগেওয়ার আরো একবার ব্রিটিশ কারাগারে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন ? আরএসএস প্রকাশিত তার জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে : ‘‘১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। ডাণ্ডি যাত্রা করে মহাত্মাজি নিজে লবণ আইন অমান্য করবেন বলে ঠিক করলেন। ডাক্তার সাহেব সব জায়গায় খবর পাঠালেন এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবে না। সে যাই হোক, যারা ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাদের বাধা দেওয়া হবে না। এর অর্থ হলো সংঘের কোনও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।” (C. P. Bhisikar– Sanshavrikrsh Ke Beej-Dr. Keshab Rao Hedgewar– New Delhi– 1994–p-20)

সি. পি. ভিশিকর লিখিত জীবনীতে আরো বলা হয়েছে : ‘‘জেলে থাকার সময় এক মুহূর্তের জন্য ডাক্তার সাহেব সংঘের কাজের কথা ভুলে যাননি। জেলে কংগ্রেসের যে সমস্ত নেতাকর্মীরা ছিলেন তিনি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সংঘের কাজকর্ম সম্পর্কে তাদের বুঝিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতের কাজ সম্পর্কে তাদের সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন।” (ওই, পৃঃ২১) ডাক্তারজি নিজেও এ প্রসঙ্গে বলেছেন : ‘‘আমরা যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি, সকলেই নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে তা করেছি। সংঘের চিন্তাধারা ও কার্য পদ্ধতির মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন হয়নি অথবা ওই গুলির উপর আমাদের শ্রদ্ধাও টলেনি। দেশের মধ্যে যত আন্দোলন চলে সেগুলির জ্ঞান প্রাপ্ত করা এবং তার সদ্ব্যবহার আমাদের কাজের জন্য করে নেওয়া প্রত্যেক সংস্থার কর্তব্য। সংঘের যারা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, আজ আমরা যারা যাচ্ছি, সকলেই এই কারণেই অগ্রসর হয়েছি।” (ওই, পৃঃ২০৮-০৯) জীবনী রচয়িতাদের এই সব বক্তব্য ও ডক্টর হেডগেওয়ারের নিজের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের প্রতি অনুগত হয়ে ডাক্তার হেডগেওয়ার জেলে যাননি, তিনি জেলে গিয়েছিলেন আরএসএস কর্মী বাহিনী তৈরীর উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে। যে সব কর্মীরা জাতীয় ঐক্যের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন ডাক্তার হেডগেওয়ার তাদের মাথায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ বপন করেছিলেন। এই বিষাক্ত পরিকল্পনার কথা বুঝতে পেরে ১৯৩৪ সালে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস কর্মীদের আরএসএস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের সদস্য হতে নিষেধ করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, স্বাধীনতা আন্দোলনের মহতী সংগ্রামে ডাঃ হেডগেওয়ারের সামান্য অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কে শক্তিশালী করা,ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করা নয়। ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না।

সাভারকরের ভূমিকা

এইবার আসি বীর (!) সাভারকরের কথায়। আরএসএস তথা সংঘ পরিবারের চোখে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিনায়ক দামোদর সাভারকর। আরএসএসের বিরুদ্ধে যখনই স্বাধীনতা সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে তখনই সাভারকরের প্রসঙ্গ তারা তুলেছে।

সাভারকর, তাঁদের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের ‘নায়ক’। সেলুলার জেলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ফলে তারা দাবি করেন, সাভারকর এমন একজন নেতা যিনি একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের চরিত্র, অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী।

এ কথা ঠিক সাভারকর জীবনের শুরুর দিকে ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে ছিলেন।

১৯০৯ সালের ১ জুলাই রাতে মদন লাল ধিংড়া লন্ডনের ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটের সভা কক্ষে উইলিয়াম কার্জন উইলিকে গুলি করে হত্যা করেন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন ডাক্তার কাওয়াস লালাকা। সেই বছরেই ২৯ ডিসেম্বর একটি থিয়েটার হলে নিহত হন নাসিক জেলার কালেক্টর এবং জেলা প্রশাসক এএম টি জ্যাকসন। হত্যাকারী ছিলেন অনন্তলক্ষণ কানহেরে। এই দুই ঘটনার পিছনেই সাভারকরের মস্তিষ্ক ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ উইলি হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকার রূপে সাভারকরকে সন্দেহ করে, অন্যদিকে জ্যাকসনের হত্যার সঙ্গে যুক্ত অনন্তলক্ষণ কানহেরের অন্য সাথীদের গ্রেপ্তার করার পর সেখানেও সাভারকরের যুক্ত থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের কাছে সাভারকরের নির্দেশ দেওয়া চিঠির সন্ধান মেলে, পাওয়া যায় কানহেরের ব্যবহৃত ব্রাউনিং পিস্তল, যেটি আসলে সাভারকরের। সাভারকর তখন প্যারিসে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য Fugitive offenders Act– ১৮৮১ ধারায় বৃহৎ মুম্বাই প্রেসিডেন্সি সরকার টেলিগ্রাফ মারফত ওয়ারেন্ট জারি করে। ১৯১০ সালের ১২ মার্চ লন্ডনে গ্রেফতার হলেন সাভারকর। দুটি ঘটনা তে মদন লাল ধিংড়া, অনন্তকানহেরে সহ মোট চারজনের ফাঁসি হয় এবং ২৭ জনের জেল হয়। বিচার হয় সাভারকরেরও। মোট তিনটি মামলায় তাকে দণ্ডিত করে ট্রাইবুনাল। একটিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অন্যটিতে ৫০ বছরের জন্য আন্দামানে নির্বাসন দণ্ড পান সাভারকর। এভাবেই একজন নায়ক রূপে সাভারকরের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সাভারকর বীর সাভারকরে পরিণত হন। কিন্তু তারপর? আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে ১৯১১ সালের চৌঠা জুলাই সাভারকরকে নিয়ে আসা হলো। তিনি বন্দি হলেন ব্রিটিশের তৈরি সেলুলার জেলে। এই জেলেই তখন বন্দি স্বাধীনতা আন্দোলনের আরো বহু যোদ্ধা। দিনের পর দিন তাঁরা হাসিমুখে সহ্য করেছেন অসহনীয় নিপীড়ন। এই জেলে থেকেই অন্য অনামী বিপ্লবীরা যে কাজ করতে ঘৃণাবোধ করেছেন বীর (!)সাভারকর কিন্তু সেই কাজই করলেন। বছর কাটার আগেই তিনি ইংরেজের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে আবেদন করলেন। কিন্তু তার কোনও সদুত্তর না পেয়ে তিনি আবার ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আবেদন পাঠালেন ১৯১৩ সালের ১৮ নভেম্বর। গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের হোম মেম্বার রেজিল্যাণ্ড দ্রাভকের উদ্দেশ্যে ‘মহামান্য’ সম্বোধন করে ১৯১১ সালে ক্ষমার জন্য যে আবেদন পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সাভারকর লিখেছিলেন : ‘‘পরিশেষে ক্ষমাভিক্ষার আবেদনটি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে পাঠ করার সময় মহামান্য হুজুরকে আমি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি কি যে, অনুমোদনের জন্য এটিকে ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হবে? ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান অগ্রগতি এবং সরকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি আরো একবার সাংবিধানিক পথটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ১৯০৬-১৯০৭ সালের ভারতবর্ষের উত্তেজক এবং আশাহীন পরিস্থিতিতে যে ভাবে শান্তি ও অগ্রগতির পথ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল আজ সেই রকম কন্টকময় পথে ভারতবর্ষ ও মানবতার কল্যাণকামী কোনও মানুষ অন্ধের মত পা ফেলবে না। কাজেই সরকার যদি তাদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন, তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকবো। যতদিন আমরা ওই জেলে থাকব, ততদিন ভারতে মহামান্য হুজুরের শত সহস্র অনুগত প্রজার গৃহে প্রকৃত সুখ আর আনন্দ থাকতে পারে না। রক্ত জলের চেয়েও ঘন। কিন্তু আমরা যদি মুক্তি পাই তাহলে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দধ্বনি তুলবে, এই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে... যে সরকার কেমন করে প্রতিহিংসা নিতে হয় এবং শাস্তি দিতে হয় এ কথার চেয়ে কেমন করে ক্ষমা করতে হয়, সংশোধন করতে হয় এ কথা আরো বেশি ভালো করে জানে। উপরন্তু দেশে ও বিদেশে অনেক বিপথগামী যুবক, যারা এক সময় পথপ্রদর্শক হিসেবে আমার দিকেই তাকিয়ে থাকতো, আমার সাংবিধানিক পথে ফিরে আসা তাদের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনবে। সরকার আমাকে যত কাজ করতে বলবে সেই মতো প্রায় সব কাজ করতে আমি প্রস্তুত। কেননা আমার আজকের পরিবর্তন যেহেতু বিবেকের দ্বারা পরিচালিত, তাই আমার ভবিষ্যতের আচরণও সেই রকমই হবে। অন্য ভাবে যা পাওয়া যেতে পারে সে তুলনায় আমাকে জেলে আটকে রাখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। শক্তিশালীর পক্ষেই একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া সম্ভব। কাজেই অনুতপ্ত সন্তান পিতৃতুল্য সরকারের দরজায় ছাড়া আর কোথায় ফিরে যাবে? মহামান্য হুজুর অনুগ্রহ করে

বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন এই আশা রইল"। (Penal settlements in Andamans– R.C.Mazumder–p. 211-213.) ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন পত্রটির ভাষা লক্ষ করুন। মুক্তি পেলে তিনি 'ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক' হয়ে থাকবেন,'সরকার যত কাজ করতে বলবে,সব কাজ করতে তিনি প্রস্তুত', তিনি সরকারের 'অনুতপ্ত পুত্র'। তাই 'পিতৃতুল্য সরকারের দরজায়' তিনি মুক্তি ভিক্ষার আর্জি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভাবা যায়? যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি চুম্বন করেছেন সেই দেশেরই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে সাভারকর কি হীনতার পরিচয় দিয়েছেন! জেল থেকে বাইরে আসার জন্য নীতি, আদর্শ, সম্ভ্রম সমস্ত কিছুই তিনি অবহেলায় বিসর্জন দিয়েছেন। একবারের জন্যও তাঁর মনে হয়নি, তাঁরই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে চারজনের ফাঁসি হয়েছে, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন আরো ২৭ জন। সেই তিনিই জেলে যাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই বাইরে আসার জন্য ক্ষমা চাইতে শুরু করলেন। বিপ্লবী জীবনে এর চেয়ে হীন কাজ আর কী হতে পারে? ক্ষমা ভিক্ষার এই আবেদনপত্রে কোনও ফল না হওয়ায় সাভারকর আবার ১৯১৮ সালে আরো দুটো আবেদন পত্র পাঠান। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। অবশেষে ১৯২০ সালের ৩০ মার্চ তিনি আরেকটা আবেদনপত্রে ক্ষমা ভিক্ষার দরুন আবেদন করেন। এই পত্রের ভাব ও ভাষা খুবই দুঃখজনক। সেই পত্রের ক্ষমা ভিক্ষার ভাষাও লক্ষ করার মতো। সুখী গৃহ কোণের আকাঙ্ক্ষায়,প্রয়োজনে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিতেও রাজি, রাজি ইংরেজের দেওয়া যে কোনও শর্ত মেনে নিতে, রাজি, ব্রিটিশের কাছে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে। যদি ইংরেজের ক্ষমা ভিক্ষা পান তবে তার পুনর্জন্ম (!) হবে। কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী নিজেকে এতটা হীন করে ফেলতে পারেন ভাবা যায়! তবুও বলতে হবে সাভারকর স্বাধীনতা আন্দোলনে উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন! যাই হোক, সাভারকরের এই হীন অবস্থা সেদিন নিশ্চয়ই ইংরেজ শাসকদের তৃপ্তি দিয়েছিল। তারা এই ধরনের মানুষকে আর আন্দামানে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আসা হল মহারাষ্ট্রের বন্দি নিবাসে। এই জেলে বোম্বের গভর্নর স্যার জর্জ লয়েড তাঁর পারিষদদের সাথে নিয়ে সাভারকরের সাথে দেখা করতে আসেন। কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকবেন না এবং জেলা শাসকের অনুমতি ছাড়া রত্নগিরি জেলার বাইরে যাবেন না এই শর্তে ১৯২৪ সালের ৬ জানুয়ারি সাভারকর মুক্তি পেলেন। একটা প্রবন্ধে কৃষণ দুবে ও ভেঙ্কটেশ রামকৃষ্ণান লিখেছেন, 'বিবেকের কোনও যন্ত্রণা ছাড়াই সাভারকর এই সব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এটাই সব নয়। তার সমস্ত উদ্দীপনা ভগ্ন, সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ চূণ বিচূর্ণ। তা দেখে সরকার প্রস্তাব দিল, তাঁর সঠিক বিচার হয়েছে এবং তাঁর দন্ডাদেশ ন্যায্য, এই ধরনের একটা বিবৃতি তাঁর দেওয়া উচিত। সাথে সাথে বলা হয়েছিল, 'এ তার মুক্তির শর্ত নয়।' তবুও সাভারকর বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'এতদ্বারা আমি স্বীকার করছি, আমার বিচার পক্ষপাতহীন এবং দণ্ডাদেশ ন্যায্য হয়েছিল। বিগত দিনে হিংসার যে পথ আমি গ্রহণ করেছিলাম আন্তরিকভাবেই সেই পথ আমি ঘৃণায় পরিত্যাগ করছি। সর্বশক্তি দিয়ে আইন এবং সংবিধানের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার মহান কর্তব্যে আমার দায়বদ্ধতা আমি অনুভব করি। ভবিষ্যতে যখনই আমাকে সংস্কারের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে, তখনই আমি তাকে সফল করার জন্য সদা আগ্রহী থাকবো'। ১৯১৮ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ডের প্রস্তাবনা, ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশার তুলনায় দুঃখজনকভাবে যা প্রায় মুষ্টি ভিক্ষার সামিল ছিল, সংস্কার বলতে এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।... তাকেই সফল করার জন্য সাভারকর তাঁর ক্ষুদ্র অস্তিত্ব উৎসর্গ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন।'

অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী সাভারকরের মৃত্যু হল। জন্ম নিল এক নতুন সাভারকর-- যিনি ব্রিটিশের বন্ধু, সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র হাতে নিয়ে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। জোরের সাথে এই সাভারকর ঘোষণা করলেন, 'প্রধানত দুটো জাতি ভারতবর্ষে, হিন্দু এবং মুসলিম' এবং 'এরা একসাথে এক জাতি গঠন করতে পারে না'। জন্ম নিলো দ্বিজাতি তত্ত্বের। দেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়া হল অমোঘ অস্ত্র।

প্রতিশ্রুতি মতো সাভারকর নিজেকে ইংরেজের কাছে প্রয়োজনীয় করে গড়ে তুলতে লাগলেন। ইংরেজ সহায়তার চরম রূপ আমরা দেখতে পেলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। পূর্ণ সামরিক সমর্থনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্রিটিশ প্রভুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সাভারকর। ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে তিনি বললেন : "ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিতে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে। যতদূর তা হিন্দু স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় ততদূর হিন্দুদের বৃহৎ সংখ্যায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে

যোগ দিতে হবে।... আবার এও মনে রাখতে হবে জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার ফলে ব্রিটিশের শত্রুদের আমাদের উপর সরাসরি আক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই, পছন্দ করি বা না করি যুদ্ধের ধ্বংস থেকে আমাদের ঘরবাড়ি কে রক্ষা করতে হবে। আর এটা করা যেতে পারে ভারতকে রক্ষা করার জন্য সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সবদিক থেকে তীব্রতর করে। তাই, হিন্দু মহাসভাপন্থীদের হিন্দুদের জাগাতে হবে। বিশেষ করে জাগাতে হবে আসাম ও বাংলায়... ।” (Savarkar Samagra, Vol. 6, Maharastra Prantic Hindu Sabha, Poona, 1963.p. 460)

জোরের সাথে সাভারকর তাঁর ‘হিন্দুত্ব’ নামক গ্রন্থে একথা বললেন। পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে এই ধারণার সামান্য সংশোধন করে তিনি বললেন, ‘‘আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুরাই হল প্রধান জাতি আর মুসলিম সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী।” ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ‘‘সাম্প্রদায়িক পথে বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী হল হিন্দু মহাসভা।” এটুকু বলেই তিনি থামেননি। এর সাথে তিনি বলেছেন, ‘মুসলিম লিগ সাভারকরের এই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল। পরবর্তীকালে এই দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়েই জিন্না সাহেব তার পাকিস্তান পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করেন।”

অর্থাৎ, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে সাভারকর তাঁর লড়াই শানিত করলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এই প্রবণতা সমস্ত হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যেই দেখা যাবে। ১৯৪২ সালে আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন ডিআর গয়াল। তিনি বলেছেন, ‘নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, যে যুবকরা আরএসএস - এ এসেছিল তারা সময়ে সময়ে চাঞ্চল্য বোধ করতো, হয়তো দেশে বিদ্যমান সাধারণ সংগ্রামী আবহাওয়ার দরুন। তাদের বলা হয়েছিল-- ‘‘আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সুযোগ আসবে। আমাদের উচিত, এই সময়ের জন্য আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে রাখা। বক্তৃতার আগুন থেকে ভাষা এবং মুসলিমদের সাথে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে তারুণ্যের জঙ্গি মেজাজের মোক্ষণ ঘটানো হতো। এইভাবে ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতি প্রবাহিত হতো মুসলিম বিরোধী ক্রিয়ার খাতে।’ (ডি আর গয়াল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, পৃষ্ঠা ৮৭)

স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মসমর্পণকারী চরিত্র সাভারকরকে ২০০২ সালে ৪ মে মরণোত্তর ভাবে সম্মান জানিয়ে ছিল তৎকালীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদবানি পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে সেখানকার বিমানবন্দর ‘বীর সাভারকর বিমানবন্দর’ রূপে নামাঙ্কিত করেন। সাভারকরের মতো একজন আত্মসমর্পণকারী চরিত্রের নামে বিমানবন্দরটি নামাঙ্কিত করলেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম ‘শহিদ দ্বীপ’ এবং ‘স্বরাজ দ্বীপ’ রেখেছিলেন সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ অবশ্য গ্রহণ করেননি তাঁরা। আমরা দেখলাম সাভারকরকে, যিনি বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন শিষ্যের হাতে, আর ধরা পড়ার পর নিজে তাদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ অস্বীকার করেছিলেন এবং সরকারের কাছে অত্যন্ত হীনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে আরও অনেক গুরু-শিষ্য আছে। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফল্ল চাকীর নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। গ্রেপ্তার হওয়ার পর জেলের মধ্যে দেখলেন নরেন গোঁসাই নামে একজন রাজ সাক্ষী হয়ে সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দিতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি এবং কানাইলাল দত্ত তাকে জেলের মধ্যেই হত্যা করেন। বিচারের দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়। একইভাবে মাস্টারদা সূর্যসেন বহু ছাত্র যুবক যুবতীকে সাক্ষাৎ মৃত্যু যজ্ঞে প্রেরণ করে নিজেও শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই মহান সংগ্রামী ব্যক্তিত্বদের পাশে কোথায় হারিয়ে যান বীর (!) সাভারকর!

সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে সহায়ক কেন্দ্র খুলেছিলেন যাতে হিন্দু যুবকরা সহজেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। পুরস্কার স্বরূপ ভাইসরয়ের জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে সাভারকরের পছন্দমত লোক মনোনীত করা হলো। এ জন্য টেলিগ্রামে ভাইসরয়কে ধন্যবাদ দিয়ে সাভারকর লিখলেন, "YOUR EXCELLENCY'S ANNOUNCEMENT DEFENCE COMMITTEE WITH ITS PERSONNEL IS WELCOME HINDU MAHASABHA VIEWS WITH SPECIAL SATISFACTION APPOINTMENT OF MESSERS KALIKAR AND JAMANDAS MEHTA." এ ভাবেই সাভারকর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেকে প্রয়োজনীয় করে গড়ে তুলেছিলেন।

এখন আমরা দেখি ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সাভারকর এবং হিন্দু মহাসভার ভূমিকা কেমন ছিল? ’৪২-এর ৮ আগস্ট কংগ্রেস ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারকে বরখাস্ত করলো। আন্দোলন দমনে ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন বহু স্বাধীনতাকামী মানুষ। নানা জায়গায় গড়ে

উঠেছিল স্বাধীন সরকার। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— 'এই সরকারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।' যে কোনো দেশপ্রেমিক মানুষের তখন কী কর্তব্য ছিল? কর্তব্য ছিল, এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। কিন্তু কী করেছিলেন সাভারকর? কী করেছিল হিন্দু মহাসভা? উত্তাল সেই ব্রিটিশ বিরোধিতার সময়েও সাভারকর এবং হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশকে সহযোগিতা করেছিল। ১৯৪২ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার ২৪তম অধিবেশনে সাভারকর বলেছিলেন, 'হিন্দু মহাসভা মনে করে সমস্ত রাজনীতির দিক নির্দেশকারী নীতি হলো দায়িত্বশীল সহযোগিতা। দায়িত্বশীল সহযোগিতার নীতির অর্থ হলো নিঃশর্ত সহযোগিতা থেকে শুরু করে সক্রিয়, এমনকি অস্ত্র হাতে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। বর্তমান সময়ের দাবি অনুযায়ী, জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী আমাদের পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।' (D. Savarkar-Hindu Rastra Darshan. Vol. 6–Poona– 1963–p. 474)

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লিগের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় যেতে রাজি হয়নি। মুসলিম লিগের ব্রিটিশ প্রীতি কংগ্রেসকে এই অবস্থান নিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য, এই সময় হিন্দু মহাসভা বাংলা, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লিগের সাথে একত্রে সরকার পরিচালনা করেছিল। এর পেছনে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদত ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সাভারকর মুসলিম লিগের সাথে এই বন্ধুত্বকে সমর্থন করে ১৯৪২ সালে হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে বলেছিলেন, 'বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা জানে যুক্তিসঙ্গত আপসের দ্বারাই আমাদের এগোতে হবে। এই যুক্তিসঙ্গত আপস এর প্রমাণ হলো, সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে এক সাথে সরকার চালাবার জন্য হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। বাংলার ঘটনাও সবার অজানা নয়। যেসব লিগপন্থীদের এমনকি কংগ্রেস তার আত্মসমর্পণের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সংযত করতে পারেনি তারা হিন্দু মহাসভার সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে আপসের মনোভাব দেখিয়েছে ও সামাজিক হতে শুরু করেছে। আর মিস্টার ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পরিচালনায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সাফল্যের সাথেই চলছে।' (সাভারকর সমগ্র, খণ্ড ৬, পৃ ৪৭৯-৮০) এই ছিলেন সাভারকর।এই ছিল তাঁর ভূমিকা। একে কেউ গৌরবজনক বলতে পারে!

শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা

সাভারকরের গৌরব গাথা প্রচারের সাথে সাথে ওরা হিন্দু মহাসভার আর এক নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম উল্লেখ করে। দাবি করে শ্যামাপ্রসাদও নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী! কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা কী দেখতে পাই? সাভারকরের মতো তিনিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন, 'এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে, যাতে মিত্রপক্ষের সাথে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়।' (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ, পৃষ্ঠা ১১৬) হিন্দু মহাসভার ঘোষণা অনুযায়ী শ্যামাপ্রসাদও '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উৎশৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হবে।' (ওই, পৃ:৬১)

এখানেই শ্যামাপ্রসাদ থেমে যাননি। আগস্ট আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'ওই পত্রের শেষ অংশে তিনি কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত গণআন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় এই আন্দোলন জনমতকে উত্তেজিত করিয়া অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করিবে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে কোনো সরকারের পক্ষেই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আন্দোলন দমন করা উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।... তিনি এই আন্দোলনের মোকাবিলা করিবার জন্য কী কার্যপন্থা গ্রহণ করা উচিত তাহারও একটা তালিকা এই পত্রে সন্নিবেশ করিয়াছেন।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রথম সংস্করণ, পৃ:৩৭৬-৭৭)

আগস্ট আন্দোলন শ্যামাপ্রসাদের কাছে 'অর্থহীন উশৃঙ্খলতা' 'নাশকতামূলক কাজকর্ম '। তিনি মনে করেন, 'এই আন্দোলন দমন করা উচিত'। কী ভাবে এই আন্দোলন দমন করা যায়, সে সম্পর্কে একটা তালিকাও তিনি ইংরেজদের কাছে পেশ করেছেন। এই শ্যামাপ্রসাদ তো সত্যিই দেশপ্রেমিক! স্বাধীনতার সংগ্রামী। এটাই ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব প্রান্তে জাপানের সহযোগিতায় অসীম বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল। যুদ্ধে যাওয়ার আগে সেনাবাহিনীর সামনে নেতাজি যে আবেগদীপ্ত বক্তব্য রেখেছিলেন তা আজও সংগ্রামী মানুষকে প্রেরণা যোগায়। সেদিন নেতাজি বলেছিলেন, 'তোমরা রণক্ষেত্রে

যাচ্ছ। কিন্তু তার আগে এই শেষ মুহূর্তেও তোমরা সত্যিই আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত রয়েছো কি না তা আবার ভেবে দেখার অবাধ স্বাধীনতা আমি তোমাদের দিচ্ছি।... যথাসম্ভব অকপটেই আমি বলছি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, দুর্গতি ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছুরই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না। এবার তোমরা স্বাধীনভাবে তোমাদের পথ বেছে নাও।’ দেশের পূর্ব প্রান্তে জাপানি সেনার সহায়তা নিয়ে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী এগিয়ে আসছে এ কথা শ্যামাপ্রসাদ এর মতো রাজনৈতিক নেতার অজানা ছিল না। অথচ সেই দিনেও শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করার জন্য আগ বাড়িয়ে বললেন, ‘বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহবাহিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হোক।... বর্তমানে প্রবল বিপদ আমাদের দ্বারে হানা দিয়াছে এবং আমাদের সংগতি নৈরাশ্যজনকভাবে সীমিত।... এই সংকটজনক পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের গৃহবাহিনী গঠন ভারতীয় সামরিক নীতির বিরুদ্ধে বলিয়া আপনি আমাকে জানাইয়াছেন। আপনারা আমাদের বিশ্বাস করিতে পারেন না, আসলে ইহাই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমাদের গুরুতর প্রয়োজনের সময়ও যদি সৈন্যবাহিনী গঠনের অধিকার দিতে আপনারা অস্বীকৃত হন তবে ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে আপনারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন।’ (শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্যামাপ্রসাদের পত্রের অংশ) ব্রিটিশ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, আর সেই সংগ্রামে শ্যামাপ্রসাদ সুভাষচন্দ্রের পক্ষে না থেকে ব্রিটিশদের পক্ষে ছিলেন, তাকে রুখবার জন্য দেশের মধ্যে হোম আর্মি গঠনের অধিকার দাবি করেছিলেন। এ থেকে আমরা কী পেলাম? তৎকালীন হিন্দু মহাসভার দুই নেতা সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করার সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ’৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন দমনে সরকারকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছিলেন। ফলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের ভূমিকা কী ছিল তা বুঝতে সচেতন মানুষের কোনও ভুল হয়নি। তাঁরা সহজেই বুঝতে পেরেছেন, এরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সব উত্তাল দিনগুলোতে ব্রিটিশের গোলামি করেছেন, শোষক ইংরেজকে সব ধরনের সহায়তা দিয়েছেন। এই কথা প্রমাণিত সত্য। এ অস্বীকার করার উপায় নেই।

গোলওয়ালকরের ভুমিকা

হিন্দু মহাসভার ভূমিকা দেখলাম। আরএসএস তখন কী ভূমিকা পালন করেছিল? সেই প্রশ্নে আসা যাক। ডাঃ হেডগেওয়ারের ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। তাঁর পরবর্তী সরসংঘচালক গোলওয়ালকরের কথা আলোচনা করা যাক।

দেশ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল, হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে তাদের সর্বস্ব দিয়ে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সেই ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আরএসএস সযত্নে নিজেদের এই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ঐতিহাসিক সেই সংগ্রাম পর্বে আরএসএসের সংঘচালক গুরুজি গোলওয়ালকর বলেছিলেন, ‘এই সংগ্রামের খারাপ ফল ফলতে বাধ্য। ১৯২০-২১ সালের আন্দোলনের পর ছেলেরা উৎশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ানোর জন্য এ কথা বলছি না। কিন্তু সংগ্রামের এই ছিল অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।...১৯৪২ সালের পর মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল আইনকানুনের পরোয়া করার দরকার নেই।’ (Collected works– Vol. 4–p-41) গোলওয়ালকর আরো বলেছেন, ‘১৯৪২ সালেও অনেকের মনে প্রবল আবেগ ছিল। সেই সময়ও সংঘ তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল। সংঘ শপথ নিয়েছিল সরাসরি কিছু করবে না।... সংঘ নিষ্ক্রিয় লোকের সংগঠন, তাদের কথাবার্তা অর্থহীন... শুধু বাইরের লোকেরা এ কথা বলতো তা নয়, এমনকি আমাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবকও কথা বলতো। তারা আমাদের প্রতি বিরক্ত ছিল।’ (ওই, পৃ:৪০)

শ্রী গোলওয়ালকার কথিত এই ‘স্বাভাবিক কাজকর্ম’ কী ছিল? এই স্বাভাবিক কাজকর্ম ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিস্তার করে আন্দোলনরত জনতার স্বাভাবিক ঐক্য বিনষ্ট করা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি, মুসলিম লিগের হাত শক্তিশালী করা। আরএসএস-এর থেকে এর বেশি কিছু আমরা কী আশা করতে পারি? কারণ ওদের মতে, ‘দীর্ঘ হিন্দু যুগের ইতিহাসই হল ভারতের ইতিহাস।... ইতিহাসে কাল পরিচিত হয় সে দেশে রাষ্ট্রীয়দের নামেই, রাজা রাজড়ার বেশধারী বিদেশি তস্কর ও একনায়কতন্ত্রীদের নামে নয়’। (চিন্তাচয়ন, প্রথম খণ্ড, পৃ, ১২৪, গোলওয়ালকর)

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে এম এস গোলওয়ালকর তার ‘We or our nationhood defined’ গ্রন্থে ‘সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’-এর কথা বলেন। এখানে আমরা হিটলারের ‘মেইন ক্যাম্পে’র প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। গোলওয়ালকর বলছেন, ‘জার্মানদের জাতিত্বের গর্ব আজ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে কলুষ মুক্ত করতে

জার্মানি গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে সেমিটিক জাতি- ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়ণ করেছে। জাতিত্বের গর্ব এখানে তার সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। জার্মানি এটাও প্রমাণ করেছে যে, নিজস্ব ভিন্ন শিকড় আছে এমন জাতি বা সংস্কৃতির একসঙ্গে মিশে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা তৈরি করা অসম্ভব। এই শিক্ষা হিন্দুস্তানে আমাদের গ্রহণ করা এবং তার থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন।' (ভিশিকর, ১৯৮০, পৃ:২৭) আমরা জানি, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশে এক প্রাণ, এক জাতি, একতার ধারণা গড়ে উঠেছিল। এই দেশকে দেশমাতা বলে অনুভূতির জন্ম হয়েছিল। যাকে আমরা এক কথায় বলি জাতীয়তাবাদী ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত এই ধারণাকে আরএসএসের তাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেননি। দেশ সম্পর্কে গোলওয়ালকরের ধারণা কী? তিনি বলছেন, 'আমাদের এই বিশাল দেশ– উত্তরে হিমালয় — উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে এর সমস্ত শাখা এবং সেখানে অবস্থিত সমস্ত অঞ্চল — দক্ষিণে সমুদ্র এবং তার সমস্ত দ্বীপ সমেত বিস্তৃত এবং পুরোটা মিলে একটি বিশাল প্রাকৃতিক একক। এই মাটির সন্তান রূপে, আমাদের বিকশিত সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে এখানে তৈরি হয়েছে।... আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সমস্ত কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ এই যে, কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসাবে এখানে বসবাস করেছে।' (চিন্তা চয়ন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩ থেকে ২৪) এ ভাবেই জাতি সম্পর্কে, দেশ সম্পর্কে নিজেদের আদর্শ ব্যক্ত করেছিল আরএসএস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরএসএসের শত্রু নয়, শত্রু প্রধানত মুসলমান ও অপ্রধানত অ-হিন্দু সম্প্রদায়গুলো। তাদের হাত থেকে এই ভারতকে উদ্ধার করতে হবে। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কার্যত কোনও ভূমিকাই ছিল না।

১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে আরএসএস যোগ দেয়নি। ১৯৪০-এর দশকের ব্রিটিশ বিরোধী উত্তাল গণআন্দোলনে আরএসএস অনুপস্থিত ছিল। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আরএসএস অংশ নেয়নি। ১৯৪৫-এর আজাদ হিন্দ অফিসারদের বিচার-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৬ এর নৌ বিদ্রোহ— কোথাও আরএসএস-কে কোনও ভূমিকা নিতে দেখা গেল না। প্রসঙ্গত, ১৯৪২ সাল নাগাদ আরএসএস প্রায় ১০,০০০ স্বয়ং-সেবক প্রশিক্ষণ দেয়, কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে মুসলিম লিগ এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের মতো আরএসএসও ব্রিটিশ বিরোধিতা করেনি। তাই মেদিনীপুরে যখন মাতঙ্গিনী হাজরা ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছেন, আসামে যখন প্রাণ দিচ্ছেন কনকলতা, যখন কলকাতার রাজপথে শহিদের মৃত্যুবরণ করছেন রামেশ্বর, তখন মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলির মতোই আরএসএস-এর গায়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের আঁচটুকু লাগেনি।

বলা প্রয়োজন, আবহমান কাল ধরে সাম্প্রদায়িক চিন্তা মানুষের হৃদয় মন অধিকার করে আছে বিষয়টা এমন নয়। এ ঘটনা সাম্প্রতিক। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তার নিজস্ব প্রয়োজন থেকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্ম দিয়েছে। তাই এই সব দেশগুলোর জনগণের মধ্যে নানা বিভক্তিকে, বিশেষ করে ধর্মীয় বিভেদকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। সাম্রাজ্যবাদ এই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে। তাই সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, এমনি সাম্প্রদায়িকতাবাদও সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে। পরাধীন ভারতে আমরা এটাই দেখেছি। এখানেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ (হিন্দু মহাসভা, আরএসএস) ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ (মুসলিম লিগ ইত্যাদি) একত্রে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যের হলেও এটাই ঘটনা যে, উভয়ের বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ছিল। যদিও এই একই বক্তব্য তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে নিজস্ব অবস্থানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রচার করে, এক ধর্মের মানুষের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের স্বার্থের মিলন হতে পারে না। তাই সংঘাত অনিবার্য। এই কারণে, হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি সমস্ত মুসলমানদের ঘৃণা করতে শেখায় আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেয়। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয়, এরা পরস্পরের ঘোর বিরোধী, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির শ্রী বৃদ্ধিতে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের মতবাদ বিস্তারের উর্বর জমি পেয়ে যায়। আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির শ্রী বৃদ্ধি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তা হিন্দু সম্প্রদায়িক শক্তির শ্রী বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাস্তবে এই দুই সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির বিরোধিতা করে। এই শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করতে চায়। তাই দেখা যায়, এই দুই সাম্প্রদায়িক শক্তিই নবজাগরণের শিক্ষার বিরোধী। মুক্তচিন্তার বিরোধী। বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে এরা ধ্বংস করতে চায়। ওরা চায় মানুষের মধ্যে অনৈতিহাসিক- অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার বীজ বপন করে দিতে। যা ফ্যাসিবাদ সৃষ্টির উর্বর জমি তৈরি করে দেবে। এ প্রসঙ্গে এ দেশের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কী বলেছেন

আমরা একটু দেখে নিই। জাতি গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘কোনও সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। অপর একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোনও জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে— এ রূপ একটি জাতিও জগতে নাই’ (বিবেকানন্দ রচনাবলি, খণ্ড ৩, পৃ, ৩৪২) জাতি গঠনের প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায়---‘শক, হূণ, দল, পাঠান, মোগল-- এক দেহে হল লীন।’ জাতীয় জীবনে ইসলামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, ‘মুসলমানেরা পুরুষাণুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল। মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইরে তার মূল ছিল না।’ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলছেন, ‘মুসলমানরা ভারতে তাদের নিজেদের বাসভূমি স্থাপন করেছে। তারা ভারতীয় জীবনে এক নতুন ও অদ্ভুত জীবনী শক্তি নিয়ে এসেছে। এই জীবনীশক্তির খুব প্রয়োজন ছিল।’ নবজাগরণের এই সব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শিক্ষা মাথায় রেখে ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনার কথা আমাদের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন। তাঁর ভাষায়, ‘এ দেশে আসিয়াও মুসলমান সংস্কৃত অক্ষরে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন। বহু বাদশা হিন্দু মঠ ও মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সে সব ঐতিহাসিক নজির দিন দিনই নতুন করিয়া বাহির হইতেছে। হিন্দু মুসলমান সাধনা এ দেশে এমন যুক্ত হইয়া গিয়াছে যে, রচনা দেখিয়া লেখক হিন্দু কি মুসলমান তাহা বলা অসম্ভব। দরাজ খান রচিত সংস্কৃত তো অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের নিত্য পাঠ্য। বাংলাদেশেও হিন্দু মুসলমান সাধনার কম যোগ হয় নাই। বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি তো আছেনই। তাহা ছাড়াও মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে মুসলমান উৎসাহদাতার অভাব নাই। হিন্দু মুসলমান উভয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু যত বিপদ বাধাইয়াছেন ধর্ম ব্যবসায়ীর দল। কবির বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবানও ধর্মব্যবসায়ীদের ভয় পান।’

আধুনিক এই ধর্মব্যবসায়ীরাই মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনার ইতিহাস কে অস্বীকার করেন। বিরোধিতা করেন নবজাগরণের যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শিক্ষা ও চিন্তাকে। আরএসএস-এর চিন্তানায়ক গোলওয়ালকরের মধ্যে আমরা এই আধুনিক ধর্মব্যবসায়ীর কুৎসিত মুখ দেখতে পাই। তাই পরাধীন যুগে দেশের মুক্তিকামী জনগণ যখন লড়ছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তাদের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ দিচ্ছেন অবহেলায়, তখন আরএসএস ব্রিটিশকে বন্ধু মনে করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করেছে। সেজন্য দেশের শহীদদের তালিকায় আরএসএসের কোন কর্মী বা নেতার নাম পাওয়া যাবে না। বন্ধুদের তালিকাতেও এদের দেখা যাবে না। আজ যতই বিজেপি - আরএসএস নেতারা’ ভারত মাতা কি জয় ‘ স্লোগান তুলে নিজেদের দেশপ্রেমিক প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাসের এই কলঙ্কময় অতীতকে তারা আড়াল করতে পারবেন তো? □

ডিজিটাল সলিউশন

প্রো: রামিজ আখতার

গ্রাফিক্স ডিজাইন ▫ পেপার/পোস্টার প্রিন্ট ▫ ফ্লেক্স প্রিন্ট ▫ টি শার্ট প্রিন্ট
স্কুল আইডি কার্ড /রিবন প্রিন্ট ▫ মেমেন্টো ▫ কাস্টমাইজড গিফট ▫ মেটাল ব্যাজ
সহ সমস্ত ধরনের প্রিন্টের কাজ করা হয়।

৫৩এ সার্পেন্টাইন লেন কলকাতা-১৪ (NRS Hospital-এর উল্টোদিকে) ফোন - ৭০০৩৯২৫৪৬৩

কাকোরী সংগ্রামের শতবর্ষ

চঞ্চল ঘোষ

কাকোরী। লক্ষ্ণৌ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের এক রেলস্টেশন। আজ শহর হলেও শতবর্ষ আগে সে দিন ছিল একটা স্বল্পপরিচিত গ্রাম। ৯ আগস্ট, ১৯২৫। সে দিন সকাল থেকে বেশ কয়েকবার বৃষ্টি হয়ে গেছে। শ্রাবণের সন্ধ্যার আকাশও মেঘাচ্ছন্ন। সাহারানপুর থেকে লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনে উঠেছে দশ জন যাত্রী। কেউ তৃতীয় শ্রেণিতে, কেউ উঠেছে দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায়। কাকোরী আর আলমনগরের মাঝে দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিল কয়েকজন যুবক। মাঠের মধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। দূরে দূরে কয়েকটা গ্রাম আবছা দেখা যাচ্ছে। তাদের একটার নাম বাজনগর। ট্রেন থেমে যাওয়ার পরে সেই যুবকেরা ছুটল গার্ডের কামরায়। সেখানে অস্ত্র দেখিয়ে তারা সরকারি সিন্দুক দখল করে নিল। সেই সময় ট্রেনে করে সরকারি অর্থ নিয়ে যাওয়া হতো। সেই সিন্দুক ভেঙে ফেলা হলো। তারপর সেই অর্থ নিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

কারা লুট করল সরকারি সিন্দুক? কারা চালালো দুঃসাহসিক অভিযান? আলোড়ন পড়ে গেল সর্বত্র। হতচকিত হয়ে পড়ল ব্রিটিশ শাসকেরা। এটা কি নিছক একটি ডাকাতি? নাকি এর পিছনে আছে বিপ্লবীদের হাত? সেই রহস্য উন্মোচনে জোর প্রচেষ্টা চলল। ঘোষণা করা হলো পাঁচ হাজার টাকা ইনাম। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনী বুঝতে পারলো এর পিছনে রয়েছে স্বদেশী বিপ্লবীরা। জানা গেল ঐ অভিযানের সংগঠক 'দ্য হিন্দুস্তান রিপাবলিক এসোসিয়েশন' (HRA)। ধরা পড়লো একে একে প্রায় সকলে। শুরু হল ঐতিহাসিক 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা'। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে।

উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগ্রাম

কাকোরী ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের দেখে নিতে হবে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামকে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রায় সূচনা পর্ব থেকেই নরমপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি চলেছে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, বঞ্চনা, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, বর্বরতার জবাব দেওয়ার জন্য গড়ে উঠল অসংখ্য গুপ্ত সমিতি। বাংলা থেকে পাঞ্জাব, সেই গুপ্ত সমিতিগুলি শরীর চর্চার পাশাপাশি অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার, আমলা, বিচারক এবং তাদের সেবক ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল। সেই সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল উত্তর ভারতের।

দিল্লিতে ভাইসরয়ের উপর আঘাত ঃ উত্তর ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনায় রয়েছে এক দুঃসাহসী বিপ্লবী অভিযান। দিনটি ছিল ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২। বিপ্লবী আন্দোলনের ভয়ে ভীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কলকাতা থেকে রাজধানী নয়াদিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই উপলক্ষে ওই দিন দিল্লি শহরে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বার হয়। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই শোভাযাত্রা চলাকালীনই হার্ডিঞ্জের উপর আঘাত হানা হবে। সেই মতো, দিল্লির চাঁদনি চক এলাকায় শহরতলির মধ্যে যখন শোভাযাত্রা যাচ্ছিল তখন হাতির পিঠে হার্ডিঞ্জের হাওদা লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। হার্ডিঞ্জ গুরুতর আহত হন। তার ছত্রধারী নিহত হয়। এরপরে শুরু হয় দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা (বা, দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা)। বিচারে বসন্ত বিশ্বাস, ভাই বালমুকুন্দ, আমির চাঁদ এবং অবোধবিহারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং লালা হনুমন্ত সহাইকে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ৮ মে ১৯১৫ দিল্লি সেন্ট্রাল জেলে আমির চাঁদের এবং ১১ মে অবিভক্ত পাঞ্জাবের আম্বালা সেন্ট্রাল জেলে তিন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

গদর আন্দোলন ঃ দিল্লির সেই বোমার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ১৯১৩ সালে শুরু হয় ঐতিহাসিক গদর আন্দোলন। উর্দু শব্দ 'গদর'-এর অর্থ হল বিদ্রোহ বা বিপ্লব। ওই বছর ১৫ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে বাবা সোহান সিং ভাকনার সভাপতিত্বে গঠিত হয় গদর পার্টি (প্রাথমিক নাম ছিল প্যাসিফিক কোস্ট হিন্দুস্তান এসোসিয়েশন)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং এশিয়ার ভারতীয় অভিবাসীদের

(migrants) নিয়ে দ্রুত গড়ে ওঠে সংগঠন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন লালা হরদয়াল, সন্ত বাবা ওয়াশাখা সিং দাদেহার, জ্বালা সিং, সন্তোক সিং, এবং সোহন সিং ভাকনা।

গদরের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করা। গদরীরা কংগ্রেসের আন্দোলনকে বিনয়ী, আইনি ও নরমপন্থী বলে মনে করত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গদরের শাখা ছড়িয়ে পড়ে। লস অ্যাঞ্জেলেস, অক্সফোর্ড, ভিয়েনা, ওয়াশিংটন ডিসি এবং সাংহাইতে গদরের সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিজেদের বক্তব্য প্রচারের জন্য সানফ্রান্সিসকোতে ১৯১৩ সালের নভেম্বরে যুগান্তর আশ্রম প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে হিন্দুস্তান গদর পত্রিকা এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সাহিত্য প্রকাশিত হত।

কোমাগাতা মারু ঃ ১৯১৪ সালের ৪ এপ্রিল ব্রিটিশ হংকং, চিনের সাংহাই, এবং জাপানের ইয়াকোহামা হয়ে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের উদ্দেশ্যে ‘কোমাগাতা মারু’ নামে একটি জাহাজ যাত্রা করে। ঐ জাহাজে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে ৩৭৬ জন যাত্রী ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে ৩৪০ জন শিখ, ২৪ জন মুসলিম এবং ১২ জন হিন্দু ছিলেন, যারা সকলেই পাঞ্জাবি এবং ব্রিটিশ প্রজা। কিন্তু কানাডা কঠোর অভিবাসন আইন বলবৎ করে তাদের প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। দুই মাসের আইনি লড়াইয়ের পরে ওই যাত্রীদের মধ্যে মাত্র ২৪ জনকে কানাডায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। বাকি ৩৫২ জনকে কানাডায় অবতরণ করতে দেওয়া হয়নি। কোমাগাতা মারুকে জোর করে কানাডা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। বাধ্য হয়ে ২৩ জুলাই জাহাজটি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার কাছে বজবজে পৌঁছায়।

কোমাগাতা মারু সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আগেই খবর ছিল। সমুদ্র থেকে হুগালি নদীতে জাহাজ প্রবেশ করতেই একটি গানবোট পাহারা দিয়ে তাকে বজবজে নিয়ে আসে। যাত্রীদের নেতা ছিলেন বাবা গুরদিত সিং সান্ধু। পুলিশ গুরদিত সিং এবং তাঁর সাথীদের গ্রেপ্তার করতে গেলে প্রতিরোধ শুরু হয়। পুলিশের গুলিতে ২০ জন নিহত হয়। গুরদিত সিং সহ কয়েকজন পালাতে সক্ষম হন। বাকিদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয় অথবা পাঞ্জাবের গ্রামে গৃহবন্দি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোমাগাতা মারুর ঘটনা উত্তর ভারত জুড়ে বিশেষত পাঞ্জাবে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাতেও সেই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। বরকতউল্লাহ, তারকনাথ দাস, বাবা সোহন সিং প্রমুখরা সেই সুযোগকে কাজে লাগান এবং অনেক প্রবাসী ভারতীয়কে গদর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন।

১৯১৫ সালের মহাবিদ্রোহের পরিকল্পনা ঃ দিল্লিতে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনার পরে মূল পরিকল্পনাকারী বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহের বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে যান এবং দেশ জুড়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯১৩ সালে বাংলায় বন্যার সময়ে বাঘা যতীন অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। ইতিমধ্যে গদর আন্দোলন উত্তর ভারতে সংগ্রামের জমি প্রস্তুত করেছে। ২৮ জুলাই ১৯১৪, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ইউরোপে ব্যস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে সেনা সংখ্যা কমিয়ে ১৫,০০০-এ নিয়ে আসে। একে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে ৫ আগস্ট ১৯১৪ গদর পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়’। গদর বিপ্লবী কর্তার সিং সারাভা অক্টোবরে কলম্বো হয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুই গদর নেতা সত্যেন সেন এবং বিষ্ণু গণেশ পিংলে। বাঘা যতীনের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে তাঁরা বেনারসে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে জানান চার হাজার গদরী ইতিমধ্যেই ভারতে এসেছেন, শীঘ্রই আরও ১৫ হাজার গদর বিপ্লবী ভারতে এসে পৌঁছাবেন। যদিও বিপুল সংখ্যক গদর বিপ্লবীকে বিদেশের বিভিন্ন বন্দরেই আটক করা হয়।

১৯১৫ সালের শুরুর দিকেই রাসবিহারী অমৃতসরে এসে পৌঁছান। ১২ ফেব্রুয়ারি এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি মহাবিদ্রোহ শুরু হবে। একই সাথে রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর, ফিরোজপুরে অভ্যুত্থান ঘটানো হবে। মূলত সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহ সংগঠিত করা হবে এবং তারপর সাধারণ মানুষকেও যুক্ত করা হবে। রাসবিহারী গ্রামের মানুষকেও এই সংগ্রামে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পাঞ্জাবে অভ্যুত্থানের খবর পাঞ্জাব মেলের মাধ্যমে হাওড়ায় এসে পৌঁছালে বাংলায় অভ্যুত্থান ঘটাবে বাঘা যতীনের বাহিনী। ক্রমে সেই লড়াই ছড়িয়ে দেওয়া হবে ঢাকা, বেনারস, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে। দেশ স্বাধীন হবে।

কিন্তু একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল ইংরেজ শাসকের কাছে। দলের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ গুপ্তচর কৃপাল সিং বিদ্রোহের পরিকল্পনার কথা বলে দিল পুলিশের কাছে। ইতিহাসের ট্র্যাজেডি এই যে আজ বিজেপি-র শাসনকালে বলিউডে কেশরী-২ চলচ্চিত্রে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে ক্ষুদিরাম সিং, প্রফুল্ল চাকীকে বারেন্দ্র কুমার নামকরণ করা হয়েছে, আর বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিংকে বানানো হয়েছে দেশপ্রেমিক

একজন শিক্ষক, যিনি তাঁর ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন!

যাই হোক, পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে লাহোরের মোচি গেটে রাসবিহারী বসুর প্রধান ঘাঁটিতে বিপ্লবীরা (১২ জন) এক গুপ্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহের দিন এগিয়ে এনে ১৯ ফেব্রুয়ারি করা হবে। কিন্তু তবুও নেমে এল ভয়ঙ্কর আঘাত। লাহোর, রেঙ্গুন, মীরাট, আগ্রায় রেজিমেন্টে এবং বাইরে তল্লাশি অভিযান শুরু হল। একে একে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন কর্তার সিং সরাভা, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, ভাই পরমানন্দ প্রমুখ। জ্ঞানী প্রীতম সিং, স্বামী সত্যানন্দ পুরী সহ কয়েকজন থাইল্যান্ডে চলে গেলেন। মহানায়ক রাসবিহারী বসুও রয়ে গেলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। শেষ পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয়ের ছদ্মবেশে পি. এন. ঠাকুর (প্রিয়নাথ ঠাকুর) ছদ্মনামে জাপানে চলে যান।

শুরু হল ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯১৫)। এই মামলায় কর্তার সিং সরাভা, বিষ্ণু গণেশ পিংলে সহ ১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কাঁসিরাম পণ্ডিতকে ফাঁসি দেওয়া হয় ২৭ মার্চ। বাকি ১৫ জনকে ১৯১৫ সালের ১৬ নভেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ৪৯ জনের মধ্যে ২৪ জনকে আন্দামান সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন

১৯১৫ সালের মে এবং নভেম্বর মাসে বহু বিপ্লবীর ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় এবং রাসবিহারী বসুর মতো নেতৃত্বের অভাবে ও অনেক সাথী আত্মগোপন করায় বিপ্লবী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে বিক্ষোভ সমাবেশে নৃশংস হত্যালীলা চালানোর পর (সরকারি হিসাবে ৩৭৯ জন নিহত, বেসরকারি মতে প্রায় ১৫০০ জন নিহত হন এবং ১২০০ জন আহত হন যাঁদের মধ্যে ১৯২ জনের আঘাত ছিল গুরুতর) বুকের ভেতর ধিকিধিকি চাপা আগুন পুনরায় দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং চৌরিচৌরার ঘটনা ঃ কংগ্রেসের আহ্বানে ১৯২১ সালে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন তীব্র রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরায় স্থানীয় মানুষজন একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ভগবান আহিরের নেতৃত্বে মূল্যবৃদ্ধি এবং মদ-বিক্রির প্রতিবাদে থানায় ডেপুটেশন দিতে গেলে দারোগার নির্দেশে তাদের পেটানো হয়, পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ গৌরীপুর বাজারে জড়ো হয়ে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু করলে পুলিশ এসে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হন। তখন মানুষ পুলিশকে তাড়া করলে তারা চৌকিতে লুকিয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা সেই চৌকিতে আগুন ধরিয়ে দিলে সেখানে থাকা ২২জন পুলিশই নিহত হয়। চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধীজি অত্যন্ত মর্মাহত হন। যদিও পুলিশী নির্যাতন এবং গুলিচালনা ও তাতে তিন জনের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়াতেই ওই ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু গান্ধীজি সেই কারণকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন। সেইমতো ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল।

গান্ধীজীর ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ ঃ গান্ধীজির এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে দেশব্যাপী সেই ঐতিহাসিক গণআন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। এই সিদ্ধান্ত সে দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায়, সুভাষচন্দ্র বসু সহ অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে ‘Himalayan Blunder’ বলে অভিহিত করেন।

গান্ধীজি সশস্ত্র সংগ্রামের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “Non-violence is my creed.” (অহিংসা আমার মূলমন্ত্র।) তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে যদি গ্যারান্টি দেওয়া হয়, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আসবে, তা হলেও আমি সেই স্বাধীনতা চাই না।’ ফলে চৌরি চৌরার ঘটনাকে তিনি ‘চরমতম অপমান’ বলে মনে করলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘Madras (Malabar) did give the warning– but I heeded not. But God spoke clearly through Chauri Chaura’ (মাদ্রাজ আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, কিন্তু আমি কান দিইনি। কিন্তু চৌরি চৌরার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাকে পরিষ্কার বলে দিলেন)। প্রসঙ্গত, বোম্বাইয়ে (১৭ নভেম্বর, ১৯২১) এবং মাদ্রাজে (১৩ জানুয়ারি, ১৯২২) এর আগে কিছু ঘটনা ঘটেছিল।

গান্ধীজির বিপ্লব-ভীতির কারণে এত বড় একটি সম্ভাবনাময় আন্দোলনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরো হিংস্র হয়ে উঠল। চৌরি চৌরার ঘটনায় ২২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশী হেফাজতে ৬ জনের মৃত্যু ঘটে, ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯২৩ সালের ২ থেকে ১১ জুলাইয়ের মধ্যে ১৯ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় দেশের ছাত্র-যুব সমাজ অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু, গান্ধীজি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল, অনড় রইলেন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'সেই সময়ে সর্বাধিনায়কের আদেশ পালন করা হইল, কিন্তু কংগ্রেস শিবিরে রীতিমতো একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। দেশব্যাপী আন্দোলনকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য কেন যে মহাত্মা চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনাকে কাজে লাগাইয়াছিলেন, ইহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। জনসাধারণের ক্ষোভ আরও অধিক হইয়াছিল এই কারণে যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা মহাত্মা প্রয়োজন বোধ করেন নাই এবং দেশের পরিস্থিতিও মোটামুটিভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অত্যধিক অনুকূল ছিল। জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌঁছিতে চলিয়াছে ঠিক তখনই পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় হইতে কম কিছুই নয়।' (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-৪২ প্রথম খণ্ড, সুভাষচন্দ্র বসু, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা, মাঘ ১৩৭৩)।

ওই বছর (২০২২) গয়া কংগ্রেসে সেই মতপার্থক্যের প্রতিফলন ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহেরু, প্রমুখ স্বরাজ্য দল গঠন করেন আর আপসহীন বিপ্লবীরা পুনরায় সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন। রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন তাঁদেরই একজন। রামপ্রসাদ একজন আর্যসমাজী ছিলেন। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল ছিল। তিনি গয়া কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালনও করেছিলেন। কিন্তু চৌরিচৌরার ঘটনার পরে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পথকেই সঠিক ও বাস্তব বলে গ্রহণ করেন।

লালা হরদয়ালের অনুমতি নিয়ে ১৯২৩ সালে রামপ্রসাদ বিসমিল এলাহাবাদে আসেন এবং বাংলার বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সাথে দেখা করেন। তারপর বিসমিল, শচীন্দ্রনাথ এবং বাংলার অপর এক বিপ্লবী সাথী যাদুগোপাল মুখার্জী মিলিতভাবে একটি সংগঠনের রূপরেখা তৈরি করেন। হলুদ কাগজে সংগঠনের নাম, লক্ষ্য, তথা সংবিধান টাইপ করা হয়। স্থির হয় সংগঠনের নাম হবে 'দ্য হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' (এইচ.আর.এ.)। ১৯২৩ সালের ৩ অক্টোবর কানপুরে এক সভায় বিপ্লবীরা মিলিত হলেন।

সভায় স্থির হয় রামপ্রসাদ বিসমিল দলের সশস্ত্র ডিভিশনের প্রধান এবং শাহাজানপুর জেলা সংগঠক হবেন, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল হবেন জাতীয় সংগঠক, অপর এক সিনিয়র সদস্য যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী বাংলার বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকা পালন করবেন। কানপুরের সভার পরে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং যোগেশ চ্যাটার্জী সংগঠন তৈরী করার কাজে বাংলায় ফিরে যান। এদিকে বিসমিলের পরিচালনায় উত্তর ভারতে নানা স্থানে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর, শাজাহানপুর প্রভৃতি স্থানে সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি সংগঠনের ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। এটি লিখেছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। সেই ইস্তাহারে 'মানুষের উপর মানুষের যত ধরনের শোষণমূলক ব্যবস্থা সম্ভব' সেগুলিকে উচ্ছেদ করার সংকল্পের কথা বলা হয় এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি করা হয়।

হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন ছিল প্রকৃত অর্থেই জাতীয়। বাংলা থেকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং যোগেশ চ্যাটার্জী, শাজাহানপুর থেকে রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খাঁ এবং মুরারীলাল, উন্নাও থেকে চন্দ্রশেখর আজাদ, বেনারস থেকে মন্মথ গুপ্ত এবং রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এটাওয়া থেকে মুকুন্দিলাল, রায়বেরেলি থেকে বনোয়ারীলাল প্রমুখ।

সংগঠনের অর্থের অভাব

এইচ.আর.এ.-তে বেশ কিছু যুবক যুক্ত হলেন। তাঁরা বাড়িঘর ছেড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে থেকে সংগঠনের কাজ করতে থাকেন। কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। আদর্শের প্রচারের জন্যও অর্থের অভাব দেখা দেয়। অস্ত্র জোগাড় করতেও টাকা লাগবে। কিন্তু এত অর্থ কোথা থেকে আসবে?' রামপ্রসাদ বিসমিল আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ 'এই সময় সমিতির সদস্যদের বড় দুর্দশা ছিল। চাঁদা পাওয়া কঠিন ছিল। সবারই কিছু না কিছু ধার হয়ে গিয়েছিল। কারো কারো কাছে আস্ত জামা-কাপড়ও ছিল না। কেউ কেউ ধর্মস্থানে গিয়ে আহার করত। চার-পাঁচ জন নিজের কেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যায়। আমি নিজে পাঁচশ' টাকা ঋণ মিটিয়েছিলাম। এই দুর্দশা দেখে আমার খুব কষ্ট হত। আমি নিজেও ভরপেট খেতে পেতাম না। আমি পনেরো বছর বয়স থেকে দিনে একবার দুধ পান করতাম। কিন্তু সাথীদের দুরবস্থা থেকে আমার আর দুধ খাওয়ার ইচ্ছা রইল না। আমিও সকলের সাথে ছাতু খেতাম। আমি ভাবতে লাগলাম এতগুলো সদ্য-যুবককে কোথায় পাঠানো যায়?' (সূত্রঃ নিজের জীবনের এক ঝলক , রামপ্রসাদ বিসমিল; পৃষ্ঠা , ৮২-৮৩)

তখনকার পরিস্থিতি বর্ণনা করে বিপ্লবী মন্মথ নাথ গুপ্ত লিখেছেন, 'পার্টির টাকার প্রয়োজন ছিল। সংগঠনের জন্য টাকার দরকার ছিল। ... আমার মনে আছে, যোগেশবাবু নিজে

রান্না করে বাসনকোসন নিজে পরিষ্কার করতেন। চন্দ্রশেখর আজাদকে তো রীতিমত উপোস করতে হত। বহু সময় আমি আবিষ্কার করেছি যে তিনি উপবাস করে আছেন। আমি তাঁকে বাড়িতে এনে খাওয়াতাম। রবীন্দ্রমোহন করকে তো ঘোড়ার দানা খেতে হত। ... চন্দ্রশেখর আজাদ একজন জাতীয়তাবাদী আচার-মোরব্বা বিক্রেতার কাছে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। আর অন্যান্য সবাই এ রকম কোনো-না-কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।' (সূত্র ঃ বিপ্লবী যুগের স্মৃতি , মন্মথ নাথ গুপ্ত)

'কেবল ব্যক্তিগত খাওয়া-পরার জন্য নয়, দল চালাতে গেলেও অর্থের প্রয়োজন। প্রচারপত্র, পুস্তক ছাপাতে হবে, অস্ত্র কিনতে হবে। বিদেশ থেকে অস্ত্র পাওয়ার ভালো সূত্র পাওয়া গেল। পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই অস্ত্র পাওয়া যাবে; সেই অস্ত্রের দামও বেশি নয়। পর্যাপ্ত সংখ্যায় একদম নতুন অস্ত্র পাওয়া যাবে। এমনকি যদি আমরা অর্থের ব্যবস্থা করে দাম মিটিয়ে দিতে পারি, তবে যত বেশি প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই অস্ত্র আমরা ধারেও পেতে পারি। ... এই সময় সমিতির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এই সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আর তার লাভ ওঠাবার চেষ্টা করার ইচ্ছা থাকলেও, অর্থ ছাড়া কিছু হওয়ার ছিল না। টাকার ব্যবস্থা করা নিতান্ত জরুরি হয়ে পড়ল।' (সূত্র ঃ নিজের জীবনের এক ঝলক, রামপ্রসাদ বিসমিল; পৃষ্ঠা , ৮৪)

অর্থ জোগাড়ের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক

কিন্তু কেমন করে অর্থ জোগাড় করা হবে? কেউ মোটা টাকা দান করছিল না। চাঁদাও বিশেষ উঠছিল না। এমতাবস্থায় বেনারসের বাঙালিটোলায় মিটিং বসল। নানা সম্ভাব্য পথ নিয়ে আলোচনা হল, কিন্তু কোনোটাই মনঃপুত হল না। অতঃপর প্রস্তাব করা হল জোর করে অর্থগ্রহণ বা ডাকাতি হবে অর্থ সংগ্রহের উপায়।

প্রতিবাদ করলেন শচীন বক্সী, বললেন, 'এই পথ গ্রহণ করতে পারি না আমরা। এতে সংগঠনকে ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।' বিসমিল তাঁর তীব্র বিরোধিতা করলেন। প্রশ্ন তুললেন, ক্লাব-লাইব্রেরি-ব্যায়ামাগার, পত্রপত্রিকা প্রকাশ এ সবের জন্য অর্থ পাওয়া যাবে কী ভাবে? বিসমিল বললেন, 'এতে এত দ্বিধা কেন? আমরাই প্রথম এ পথ গ্রহণ করছি না। এই পথ গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবীরা, রাশিয়ার বিপ্লবীরাও এই পথ গ্রহণ করেছেন, বাঙলার বিপ্লবীরাও এই পথ গ্রহণ না করে পারেননি। তাহলে আমরাই বা গ্রহণ করব না কেন?'

এবারে মুখ খুললেন আসফাকউল্লা। বললেন, 'আমরা এই পথ গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা কোথাও সুখকর নয়।' দীর্ঘ যুক্তি-প্রতিযুক্তি চলল শেষ পর্যন্ত বিসমিলের প্রস্তাব গৃহীত হল। ঠিক হল জোর করে অর্থ আদায় করা হবে।

১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। পিলভিট জেলার বামরাউলি গ্রামে মহাজন বলদেও প্রসাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হল। দ্বিতীয় অভিযান ওই জেলারই বিচপুরী গ্রামে। তারিখ ছিল ১৯২৫ সালের ৯ মার্চ। প্রথম অভিযান সফল হলেও দ্বিতীয় অভিযানে কিন্তু অর্থ পাওয়া গেল না। অতঃপর তৃতীয় অভিযান। ১৯২৫ সালের ২৪ মে, সেই অভিযানের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। প্রবল প্রতিরোধের সামনে পড়ে বিপ্লবীদের পিছু হটতে হল। তাঁরা বুঝলেন এইভাবে অর্থ সংগ্রহে ঝুঁকি অনেক; বিপরীতে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। কিন্তু অর্থসংকট দূর হচ্ছে না, বরং ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এমন সময় রামপ্রসাদ বিসমিলের মাথায় এক পরিকল্পনা এল।

তাঁর ভাষায় ঃ 'কোনো উপায় না দেখে ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ডাকাতি করা আমাদের অভীষ্ট ছিল না। ভাবলাম যদি লুট করতেই হয়, তবে কেন সরকারি মাল লুট করি না। এই মনে রেখে চলছিলাম, তো একদিন ট্রেনে করে যাত্রা করার সময় গার্ডের কামরার কাছে গাড়িতে বসেছিলাম। দেখলাম স্টেশন-মাস্টার একটা থলি এনে গার্ডের বাক্সে ঢেলে দিল। একটা ঘরাম-ঘরাম শব্দ হতে নেমে দেখলাম একটা লোহার সিন্দুক রাখা আছে। ভাবলাম ঐ সিন্দুকেই পয়সার থলি রাখা হয়েছে। পরের স্টেশনে নিজের চোখে সিন্দুকে থলে রাখতে দেখলাম। অনুমান করলাম গার্ডের কামরায় সিন্দুকটাকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা থাকে, হয়ত সিন্দুকে তালা লাগানো আছে, দরকার পড়লে তালা খোলা হয়। এর অল্প কিছুদিন পরে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে দেখলাম একজন কুলি লোহার সিন্দুক নামাচ্ছে। দেখলাম তাতে কোনো চেন বা তালা নেই। এমনিই রাখা আছে। তখনই মনে মনে ঠিক করলাম এই অর্থই হস্তগত করতে হবে। (সূত্র ঃ ওই, পৃষ্ঠা, ৮৫)

বিসমিল মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, সরকারি অর্থ লুট করে সেই অর্থ সরকারের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে। যারা ২০০ বছর ধরে প্রতিনিয়ত ভারতকে লুট করছে, তাদের সিন্দুক লুট করা কোনো অপরাধ নয়। তিনি দলীয় সভায় ট্রেন-ডাকাতির প্রস্তাব রাখলেন। বললেন, 'ছোট একটা স্টেশন বেছে আমাদের

কাজ করতে হবে।' সোৎসাহে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন মন্মথ গুপ্ত। চন্দ্রশেখর আজাদও মাথা নেড়ে বোঝালেন তিনি রাজি। দলের প্রায় সকলেই রাজি। তরুণ বিপ্লবীদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু, আবার বেঁকে বসলেন, দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী আসফাকউল্লা। আসফাকের যুক্তি হল সরকারি অর্থ লুট করার অর্থ হল সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া। সংগঠনের তৎকালীন অবস্থায় সেই ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। কারণ সরকারের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র সংগঠনের কাছে নেই। তাই সরকারি খাজানা লুট করার মানে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। কিন্তু আসফাকের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও দলের কার্যকারী সমিতি ট্রেন ডাকাতির পরিকল্পনায় সীলমোহর লাগিয়ে দিল। আসফাক দলের নেতা বিসমিলকেও বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ততক্ষণে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। বিসমিল আসফাককে রাজি করালেন। আপত্তি সত্ত্বেও দলের সিদ্ধান্ত আসফাকউল্লাকে মেনে নিতে হল। সংগঠনের কেউ কেউ 'ট্রেন-ডাকাতির' সময় ড্রাইভার বা গার্ড ইংরেজ হলে তাদেরও গুলি করে মেরে ফেলার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু বিসমিল স্পষ্ট করে বলে দিলেন কোনো অযথা রক্তপাত করা চলবে না।

অনেক কথাবার্তার পর সিদ্ধান্ত হল যে সাহারানপুর-লক্ষ্ণৌ-এর মধ্যে চলাচলকারী ৮-ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সরকারি কোষ লুট করা হবে। সেই অভিযানে থাকবেন– ১) পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল, ২) আসফাকউল্লাহ খাঁ, ৩) চন্দ্রশেখর আজাদ, ৪) রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ৫) মুকুন্দিলাল, ৬) মন্মথনাথ গুপ্ত, ৭) বনওয়ারী লাল, ৮) শচীন্দ্রনাথ বক্সী, ৯) মুরারীলাল, ১০) কুন্দনলাল। যদিও আসল দিনে ২৫-৩০ জন যুবক ছিল।

ঠিক হল ৮ আগস্ট অভিযান চালানো হবে। আগের দিন রাতের বেলায় সকলে পৌঁছে গেলেন লক্ষ্ণৌ শহরের ছেদীলাল ধর্মশালায়। পরদিন দুপুরে প্রায় এক ঘন্টা পায়ে হেঁটে তাঁরা পৌঁছালেন লক্ষ্ণৌ-এর ঠিক পরের স্টেশন আলমনগরে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটা ছোট স্টেশন। লোকজন প্রায় নেই। স্টেশন মাস্টারকে কব্জা করে ওখানেই টাকা নামানো সুবিধাজনক। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল মাত্র দশ মিনিট আগে ট্রেন বেরিয়ে গেছে। কারো সন্দেহ হল ওটাই সেই ট্রেন তো! মুরারীলাল খবর নিয়ে এলেন , হ্যাঁ, ওটাই সেই ট্রেন। অতঃপর তাঁরা ছেদীলাল ধর্মশালায় ফিরে আসলেন। ওই রাতেই ধর্মশালাতে পুনরায় একটি সভায় বসলেন বিপ্লবীরা।

সেই মিটিংয়ে স্থির হল পরদিনই অভিযান চালানো হবে। ট্রেন ধরা হবে শাজাহানপুর থেকে। সকলে সেখানে পৌঁছে যাবে সময়মত। কোনো ছোট স্টেশনে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করা হল। স্টেশন ছোট হলেও সেখানে স্টেশন-মাস্টার সহ বেশ কিছু রেলযাত্রী থাকবে। সেই তুলনায় বিপ্লবীদের সংখ্যা অনেক কম। তাই সিদ্ধান্ত হল দুটি স্টেশনের মাঝে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে এই অপারেশন চালানো হবে।

ঐতিহাসিক অভিযান

৯ আগস্ট, বৃষ্টিভেজা দিন। লক্ষ্যভেদে বিপ্লবীরা অবিচল। শাজাহানপুর থেকে যাত্রী সেজে ট্রেনে উঠলেন তাঁরা। তৃতীয় শ্রেণি থেকে অ্যালার্ম চেন টানলে যদি গাড়ি না থামে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল চেন টানা হবে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী রইলেন সেই দায়িত্বে। তিনি ছাড়াও আসফাক এবং শচীন বক্সী বসলেন ওই কামরায়, বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে উঠলেন তৃতীয় শ্রেণিতে। একজন খবর দিলেন সেদিন ওই গাড়িতে সরকারি তহবিল ছাড়াও অন্য অর্থ যাচ্ছে। মুরারীলাল খবর দিল কয়েকজন যাত্রীর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এছাড়া জনাকয়েক গোরা সেপাইও যাচ্ছে ওই ট্রেনে; তা ছাড়া সরকারি কোষের পাহারায় একজন বন্দুকধারী সৈনিকও আছে। কিন্তু বিপ্লবীরা অকুতোভয়। একে একে পার হয়ে যাচ্ছে স্টেশন। ট্রেন কাকোরী ছেড়ে আলমনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হল। তার পরের স্টেশন লক্ষ্ণৌ। নাহ! সময় এসে গেছে! চেন টেনে দিলেন রাজেন্দ্রনাথ।

লোহার চাকা তীব্র গোঙানি করে থেমে গেল। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল মাঠের মাঝে। বিপ্লবীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী ছুটল গার্ডের কামরার দিকে। কোনো যাত্রী কামরার জানালা দিয়ে মাথা বার করে দেখতে চাইল , কী হয়েছে! তাদের চেঁচিয়ে মানা করে দেওয়া হল। বলা হল, সরকারি খাজানা দখল করা হবে। যাত্রীদের কোনো ভয় নেই; তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। তারা যেন শান্ত ভাবে নিজ নিজ আসনে বসে থাকে। বিপ্লবীরা কিছু সময় পরে পরে আকাশের দিকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে কেউ বাধা না দেয় সেটা সুনিশ্চিত করা। বিপ্লবীদের বাধা দিতে কেউ এগিয়ে এলো না। 'ওই গাড়িতে চোদ্দ জন এমন মানুষ ছিলেন যাদের কাছে বন্দুক বা রাইফেল ছিল। দু'জন সশস্ত্র ইংরেজ ফৌজি জওয়ান ছিল। কিন্তু সকলে শান্ত ছিল। ড্রাইভার, আর ইঞ্জিনিয়ার দু'জনের অবস্থা ছিল সবথেকে খারাপ। ড্রাইভার ইঞ্জিনে শুয়ে পড়েছিল, আর ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় পায়খানা ঘরে লুকিয়ে পড়ে।' (সূত্রঃ বিসমিলের আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা , ৮৬)

এই অপারেশন যখন চলছিল, তখন হৈ-চৈ শুনে একজন

যাত্রী নিজের কামরা থেকে নেমে এসেছিল। তার স্ত্রী অন্য কামরায় ছিল। স্ত্রী ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য যাত্রীটি সেই কামরার দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। তার উপর কেউ একজন গুলি চালিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে। বিপ্লবীদের কেউ সেই গুলি চালায়নি, কারণ লাইন থেকে খানিকটা সরে গিয়ে তাঁদের শূন্যে গুলি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গার্ডের কামরা থেকে এক ব্যক্তি নিচে নেমেছিলেন, তার কাছে মাউজার পিস্তল ছিল। এটা সম্ভবত সেই ব্যক্তির কাজ। অন্তত রামপ্রসাদ বিসমিলের তাই অনুমান। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি সে কথা লিখে গিয়েছেন। (সূত্র ঃ ওই; পৃষ্ঠা , ৮৬) কিন্তু বিপ্লবী মন্মথ নাথ গুপ্ত (১৯০৮, ২০০০) বলেছেন অন্য কথা। ১৯৯৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর কাকোরী কাণ্ডের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দূরদর্শনকে দেওয়া তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারে মন্মথনাথ গুপ্ত বলেছিলেন সেই ঐতিহাসিক দিনে গুলিটা ভুলবশত তিনিই চালিয়েছিলেন। তাঁর গুলিতেই আহমেদ আলি নামক এক ভারতীয় যাত্রীর মৃত্যু হয়। (সাক্ষাৎকারে মন্মথনাথ গুপ্ত ঐ গুলি চালনার জন্য ভুল স্বীকার করেছিলেন এবং নিজের ফাঁসি হয়নি বলে দুঃখ ব্যক্ত করেন।) (সূত্রঃ https-//theanisike.wordpress.com)

ইতিমধ্যে গার্ডের কামরা থেকে লোহার ভারী সিন্দুক নামিয়ে আনা হয়েছে। এত ভারী জিনিসটাকে বহন করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চেন-তালার ওপরে ছেনি, তার ওপরে পড়ছে হাতুড়ির দমাদম বাড়ি।। কিন্তু হাতুড়ির আঘাতে তালা ভাঙছে না। দেরী হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। এগিয়ে এলেন আসফাক। মন্মথের হাতে পিস্তলটা রেখে হাতের বড় হাতুড়িটা দিয়ে একের পর এক আঘাত হানতে লাগলেন বড় তালাটার উপর। ততক্ষণে অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে। এমন সময় দূর থেকে একটা ট্রেনের আলো দেখা গেল। তবে কি ব্রিটিশ পুলিশ খবর পেয়ে গেছে! আশঙ্কিত হয়ে পড়ে সবাই। তাঁরা অস্ত্র লুকিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ গাছের পিছনে পজিশন নেন আসন্ন লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু ট্রেনটি দাঁড়াল না। ঝমাঝম শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল পাশের লাইন দিয়ে। বিপ্লবীদের মনে পড়ল ঠিক ঐ সময় সেখান দিয়ে পাঞ্জাব মেল যাওয়ার কথা। কিন্তু কাজের উন্মাদনায় তাঁরা সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবার শুরু হল সিন্দুক ভাঙার কাজ। আসফাকের হাতুড়ির আঘাতের পর আঘাতে সিন্দুকের মুখ খুলে গেল। লক্ষ্যপূরণ হল বিপ্লবীদের। বিপ্লবীরা সেই সিন্দুক থেকে থলে বার করে নিজেদের ব্যাগে ভরতে লাগলেন। তিনটি থলিতে টাকা ভরা হল। পথে সেই অর্থ আরও কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বেঁধে নেওয়া হয়।

কাজ হয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। পিছনে পড়ে রয়েছে ট্রেনটা। ব্রিটিশের সিন্দুক ভেঙে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অর্থ নিয়ে সেই আঁধারে মিলিয়ে গেলেন তাঁরা। ৯ আগস্ট দিনটা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়ে গেল।

আত্মগোপন পর্ব

অভিযান সফল। এবার আত্মগোপন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী মন্মথনাথ গুপ্ত বলেছেন, ‘মাল সংগ্রহ করে পালাবার হুকুম দেওয়া হল। কী করে ফিরে এলাম তার খুঁটিনাটি দেবার দরকার দেখি না। আমরা পায়ে হেঁটে লক্ষ্ণৌ-এ গেলাম। তখুনি মাল নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল , অস্ত্রশস্ত্রও নিরাপদ স্থানে পাঠানো হল। যাদের যাবার জায়গা ছিল, তারা সেখানে চলে গেল। কিন্তু আমার মতো যারা শহরটাকে ভালো করে জানতাম না তারা পার্কে রাত কাটালাম। খুব ভোরে ধার্মিক লোকেরা যখন স্নান করতে যাচ্ছিলেন তখন আমরা উঠে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেলাম।’ (সূত্রঃ বিপ্লবী যুগের স্মৃতি)

এই দুঃসাহসিক অভিযানে আলোড়ন পড়ে গেল সর্বত্র। সরকারের ভ্রূ কোঁচকাল। রেল কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন। কারা করল এই কাজ? এই ঘটনার পিছনে যারাই থাকুক না কেন খুঁজে বার করতে হবে তাদের। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল ইংরেজদের গুপ্তচর। জোর কদমে কাজ শুরু করে দিল পুলিশ বাহিনী। খবর দিতে পারলে মোটা টাকা ইনাম মিলবে।

ক্রমে পুলিশ বুঝতে পারল এটা কোনো অর্থ লোলুপ ডাকাত দলের কাজ নয়। এর পিছনে আছে সুগভীর পরিকল্পনা। এটা স্বদেশী বিপ্লবীদের কাজ। কাকোরী অভিযানের কুশীলবরা ‘হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের’ সঙ্গে যুক্ত।

কী ভাবে তারা ধরতে পারল? ডাকাতি হওয়া কয়েকটা একশো টাকার নোট শাজাহানপুর শহরে পাওয়া গেল। নোটের নম্বর দেখে পুলিশ বুঝতে পারল এগুলো সেই লুট হওয়া নোট, ফলে তার ‘উৎস’ কাছাকাছিই আছে। রামপ্রসাদ দীর্ঘদিন সন্দেহের তালিকায় ছিলেন। তাঁর উপর নজরদারি বাড়ল। ফল মিলল। তারা পেয়ে গেল আর একজন সাথী ইন্দুভূষণ মিত্রের সন্ধান। তিনি বিপ্লবীদের লিংকম্যান ছিলেন। তাঁকে পাঠানো চিঠি ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হাতে পড়ল। সেই চিঠির সূত্র ধরে ব্রিটিশ পুলিশ জানতে পারল ১৩ সেপ্টেম্বর মীরাটের বৈশ্য অনাথ আশ্রমে বিপ্লবীদের গোপন সভা বসবে। ইন্দুভূষণের চিঠিটা পুনরায় মুখ বন্ধ করে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল,

যাতে বিপ্লবীদের সন্দেহ না হয়। পুলিশ ১৩ তারিখের মিটিং বানচাল করে দিল না। যারা সেই মিটিং-এ এসেছিলেন ব্রিটিশ চরেরা তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল। ১৪ সেপ্টেম্বরের সকালের মধ্যে পুলিশের হাতে সকলের নাম-ঠিকানা চলে আসল। একসঙ্গে গোটা যুক্ত প্রদেশ (United Province – UP) জুড়ে শুরু হল পুলিশী অভিযান।

১৯২৫ সালের ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ভোর-রাতে বেনারসে নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হলেন মন্মথনাথ গুপ্ত। খানাতল্লাশি করে কোনো অস্ত্রের সন্ধান মিলল না; কিন্তু পাওয়া গেল হলুদ কাগজ, অর্থাৎ এইচআরএ-র শাসন পরিকল্পনা। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের ঘরের তালা ভেঙে পুলিশ পেল একটা রাইফেল। গ্রেপ্তার করা হল বীরভদ্র তেওয়ারী এবং রামদুলারী ত্রিবেদীকে। এলাহাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হলেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

আত্মবিশ্বাসী রামপ্রসাদ বিসমিল বাড়িতেই ছিলেন। তিনি মনে করতেন পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারবে না। ২৬ সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিল। নিজের আত্মজীবনীতে রামপ্রসাদ লিখেছেন, 'ভোর চারটেয় জেগে উঠে শুনলাম বাইরের দরজায় বন্দুকের কুঁদোর আওয়াজ। বুঝলাম পুলিশ এসে গেছে। দ্রুত দরজা খুলে বাইরে গেলাম। এগিয়ে এসে একজন পুলিশ অফিসার আমার হাত চেপে ধরল। আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম।' (আত্মজীবনী ঃ পৃষ্ঠা ৮৭) শাজাহানপুর থেকে একে একে গ্রেপ্তার হলেন ঠাকুর রোশন সিং, হরগোবিন্দ, বানারসীলাল ও প্রেমকিষেণ খান্না। সেই রাতে থিয়েটার দেখতে যাওয়ায় তখনকার মত বেঁচে গেলেন শচীন বক্সী। অনেক রাতে বাড়ি ফেরার সময় দূর থেকে দেখলেন বাড়ির সামনে জটলা। অবস্থা বেগতিক দেখে সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন বোম্বে। সেখানে ডকে শ্রমিকের কাজ করলেন। পরে চলে আসলেন বিহারের ভাগলপুরে এক বাঙালী বন্ধুর কাছে। কাশীর পুলিশ গ্রেপ্তার করল কানপুরের সুরেশ ভট্টাচার্যকে এবং রাজেন লাহিড়ীর 'চিঠির বাক্স' বলে পরিচিত রামনাথ পাণ্ডেকে।

পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চন্দ্রশেখর আজাদ চলে এলেন ঝাঁসীতে। সেখানে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ড্রইং শিক্ষক রুদ্রনারায়ণ সিংহ বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা। তাঁর পরামর্শে শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তারার নদীর পারে ঔরছা জঙ্গলে এক হনুমান মন্দিরে আশ্রয় নিলেন আজাদ। এরপর থেকে ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের অ্যালফ্রেড পার্কে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি প্রকৃতই 'আজাদ' বা মুক্ত ছিলেন।

কাকোরী কাণ্ডের পরে বিসমিল রাজেন লাহিড়ীকে বাংলায় পাঠান বোমা তৈরী শেখার জন্য। তিনি কলকাতায় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দক্ষিণেশ্বরে বিপ্লবীদের একটি গোপন ঘাঁটিতে রাজেন্দ্রনাথ বোমা তৈরী শিখছিলেন। ১০ নভেম্বর এক সহকর্মীর অসতর্কতায় একটি বোমা ফেটে যায়। বিস্ফোরণের প্রবল শব্দে পুলিশ সতর্ক হয়ে যায় এবং রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী সহ ৯ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা। সেই মামলায় রাজেন লাহিড়ীর দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। পরে সেই সাজা কমিয়ে পাঁচ বছরের করা হয়। কিন্তু ততদিনে ব্রিটিশ পুলিশ জানতে পেরে গেছে কাকোরী কাণ্ডে তাঁর ভূমিকার কথা। ফলে তাঁকে লক্ষ্ণৌ আনা হয় এবং কাকোরী মামলায় অন্যতম আসামী করা হয়।

আসফাকউল্লা খাঁ কাকোরী কাণ্ডের পরে শাজাহানপুরে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। যেদিন রামপ্রসাদ বিসমিল এবং অন্যরা গ্রেপ্তার হলেন সেই ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। রাতে ঘর থেকে দেখলেন বাড়ির বাইরে কারা যেন ঘোরাফেরা করছে। বুঝলেন পুলিশ এসে গেছে। ঘুম থেকে ডেকে তুললেন দাদা সর্ফতুল্লাকে। বললেন সব কথা। দাদার পরামর্শে আশ্রয় নিলেন বাড়ির জেনানা মহলে। পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে গেল দাদাকে। সর্ফতুল্লা বললেন, আসফাক বাড়ি নেই। থানা থেকে বলে দেওয়া হল দ্রুত যেন আসফাককে আত্মসমর্পণ করানো হয়। আর বাড়ির রাইফেলটাও থানায় জমা দিতে বলা হয়েছে। পরদিনই গভীর রাতে বাড়ি ছাড়লেন আসফাক। গেলেন কানপুরে; 'প্রতাপ' পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবীদের পরম সুহৃদ গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর কাছে। তাঁর ব্যবস্থাপনায় ভূপাল হয়ে আসফাক চলে গেলেন ডালটনগঞ্জে। সেখানে আশ্রয়দাতা তাঁর পরিচয়টুকুও জানতে চায় না। ইতিমধ্যে আসফাক পড়ে ফেলেছেন বিভিন্ন বিপ্লবী বই, জেনেছেন রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের কথা। তিনি রাশিয়া যেতে চান। যোগাযোগ করতে চান সেখানকার বিপ্লবীদের সাথে। আট মাস পরে এক রাতে অন্ধকারে নামলেন শাজাহানপুর স্টেশনে। বাড়ি ফিরলেন মাত্র একটা দিনের জন্যে। তারপর আবার কানপুরে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর কাছে। 'প্রতাপ' পত্রিকার অফিসে একটা পিছনের দিকের ঘরে আশ্রয় নিলেন আসফাক। সেখান থেকে ফের ভূপাল। ভূপালে দু' মাস কাটিয়ে এসে উঠলেন পুরানো দিল্লির এক নতুন আশ্রয়ে। মুসলিম মহল্লা। এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আশ্রয় পেলেন।

রাশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকলেন সেখানে বসে। ছোটবেলার বন্ধু হাবিবের সঙ্গে সেই পরিকল্পনা এগোতে থাকে। এক রাতে তাঁর ঘরে এলেন সেই পরিবারের এক মুসলিম তরুণী। সুপুরুষ আসফাককে ভালোবাসতে চান। কিন্তু, আসফাকের জীবন তো এই দেশের স্বাধীনতার জন্য বলিপ্রদত্ত। সেই কথা জানালেন মেয়েটিকে। রাতের অন্ধকারে এসেছিলেন, বুকে ব্যথা চেপে রেখে রাতের অন্ধকারেই ফিরে গেলেন তরুণী। নতুন পরিকল্পনায় দিন কাটে আসফাকের। হঠাৎ এক রাতে দরজায় খটখট শব্দ শুনে খুলে দেখেন পুলিশ। সাথে আছে হাবিবের বাবা সৈয়দ মুস্তাক আহমেদ। তারিখটা ছিল ১৯২৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর। কাকোরী কাণ্ডের ঠিক তেরো মাসের মাথায় গ্রেপ্তার হলেন আসফাকউল্লা। প্রথমে দিল্লির কারাগারে রাখলেও কয়েক দিন পরেই তাঁকে আনা হল লক্ষ্ণৌ জেলে। সেখানেই রামপ্রসাদ বিসমিল সহ অন্য বিপ্লবীদের রাখা হয়েছে।

রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খাঁ'র বন্ধুত্ব সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক উজ্জ্বল মশাল

রামপ্রসাদ বিসমিল একজন আর্যসমাজী ছিলেন। তিনি দৈনিক পুজা করতেন। দিনে একবার দ্বিপ্রহরে খাদ্য গ্রহণ করতেন। মোটা রুটি, মশালা ছাড়া সিদ্ধ শাকসব্জী খেতেন। নিরামিষভোজী ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর বন্ধু তথা সহকর্মী আসফাকউল্লা খাঁ ছিলেন বনেদী মুসলিম পরিবারের সন্তান। কোরান পাঠ করতেন। নামাজ পড়তেন নিয়ম মেনে। ধর্ম দুজনের ভিন্ন, কিন্তু পথ এক। সেই পথ ভারতের স্বাধীনতার পথ। সেই পথে যেমন রামপ্রসাদ বিসমিলের চলার অধিকার আছে, তেমনই আসফাকউল্লারও আছে। তাই আসফাক রামপ্রসাদকে নেতা হিসাবে মেনে নেন। নেতার সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে, কিন্তু সকলের যেটা সিদ্ধান্ত তাকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। ধর্মের প্রসঙ্গ তুলে আসফাককে রাজসাক্ষী হওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছেন দিল্লি থেকে লক্ষ্ণৌ যাত্রায় এক কামরায় সফর করা ম্যাজিস্ট্রেট আইনুদ্দিন সাহেব। কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছেন, 'রামপ্রসাদ তো চায় হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে। মুসলমান হয়েও সেই কাজে আপনি সাহায্য করবেন?' প্রতিবাদ করেন আসফাক। দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় রামপ্রসাদ, কে বলল আপনাকে? আমরা কেউই হিন্দু-মুসলিম কোনো রাজই প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আমরা চাই স্বাধীন ভারত। যেখানে থাকবে না উঁচু-নীচু ভেদাভেদ আর ধর্মে ধর্মে হানাহানি; মানুষ যেখানে বাস করবে মানুষের মতো।' আর রামপ্রসাদ লিখলেন, 'অনেকে আমাকে সাবধান করত, মুসলমানকে বিশ্বাস করো না– ঠকে যাবে। তোমারই জয় হয়েছিল। তোমাতে আমাতে কোনও প্রভেদ ছিল না। অনেক সময় এক থালাতেও খেতাম আমরা। আমি মনে করতাম না হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য আছে। তুমি ভালবাসতে আমাকে। আমার প্রতি ছিল তোমার অগাধ আস্থা। একবার বুকের ব্যথায় যখন তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তখন তোমার মুখ দিয়ে বারবার 'রাম' 'রাম' শব্দ বেরিয়ে আসছিল। পাশে দাঁড়ানো ভাইয়েরা আর আত্মীয় স্বজনরা অবাক হয়েছিল। 'রাম' 'রাম' কথার অর্থ কী ? তখন একজন বলল, 'রাম' মানে রামপ্রসাদ বিসমিল। তাড়াতাড়ি আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। আমাকে দেখার পর তুমি শান্ত হয়েছিলে। তখন সবাই 'রাম' শব্দের অর্থ বুঝেছিল।

এই বন্ধুত্ব ভালোবাসার পরিণতি কী হয়েছে? আমার চিন্তার সঙ্গে তোমার ভাবনা মিলে গিয়েছিল। তুমিও যথার্থ বিপ্লবীতে পরিণত হয়েছিলে। তখন তোমার দিনরাত চিন্তা ছিল মুসলিম যুবকদের মধ্যে এই দেশপ্রেমের ধারণা কিভাবে সঞ্চারিত করবে যাতে তারাও বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। তোমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে তুমি। অনেক বিপ্লবী সাথীও অবাক হয়ে ভাবত আমি কেমন করে একজন মুসলমান তরুণকে বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠিত সদস্যে পরিণত করলাম। আমার সাথে তুমি যে সব কাজ করেছিলে তা মনে রাখার মতো। আমার কোনো আদেশ তুমি কখনো অবহেলা করনি। একজন আজ্ঞাবাহী ভক্তের মতো তুমি আমার নির্দেশ পালন করতে। তোমার হৃদয় ছিল বিশাল, চিন্তা ছিল সুমহান।

... আমার আনন্দ, এই দুনিয়ায় তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ। আসফাকউল্লা বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, ভারতের ইতিহাসে এ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে।

... প্রিয় ভাই আমার, জেনে খুশি হবে, বাবা-মার ধন-সম্পত্তি দেশের কাজে ব্যয় করে তাদের ভিখারী করেছি। দেহ-মন সমস্ত কিছু দেশমাতৃকার সেবায় অর্পণ করে আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছি। সেই আমি, রামপ্রসাদ, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আসফাককেও দেশমায়ের সেবায় উৎসর্গ করছি।'

আসফাকউল্লার আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু মুসলমান তরুণ ও যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ও তাঁদের মধ্যে অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

আজ যখন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এই তিনটি দেশের কোনোটিকে হিন্দু রাষ্ট্র, কোনোটিকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে, বা তার চেষ্টা চলছে, তখন রামপ্রসাদ বিসমিল এবং

আসফাকউল্লার এই বন্ধুত্ব, দেশপ্রেম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক জলন্ত মশাল হয়ে পথ দেখাবে।

আদালতে কাকোরী মামলা

গ্রেপ্তারির পর সনাক্তকরণ পর্ব। টি.আই. প্যারেডে রামপ্রসাদ চেষ্টা করলেন অন্যদের মতো স্বাভাবিক থাকতে, যাতে তাঁকে কেউ চিনতে না পারে। কিন্তু যে সনাক্ত করতে এল তাকে দেখে চমকে উঠলেন। তাকে চিনিয়ে দিতে এসেছে দলের তরুণ কর্মী বানারসীলাল। সে দলের কাজ করে প্রশংসা পেতে চাইত। আর আজ সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করল! বিস্মিত হলেও রামপ্রসাদ হতাশ হলেন না। এমন বেইমানি তো স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম নয়। পুলিশের নির্যাতন, কিংবা প্রলোভনের শিকার যারা হয়েছে, তাদের জন্য স্বাধীনতার লড়াই থেমে থাকবে না। গ্রেপ্তারের পরে প্রথম দিকে রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা সহ অনেককেই রাজসাক্ষী করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সকলে নরেন গোঁসাই বা বানারসীলাল নয়। তাঁরা ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

আসফাকউল্লা খাঁ এবং শচীন বক্সী অনেক পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু কাকোরী কাণ্ডের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই। ১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি লক্ষৌয়ের বিশেষ সেশন আদালতে শুরু হল ঐতিহাসিক 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা'। মামলায় মূল আসামী রামপ্রসাদ বিসমিল। অন্য অভিযুক্তরা হলেন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন সিং, গোবিন্দচরণ কর, মুকুন্দীলাল গুপ্ত, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, মন্মথনাথ গুপ্ত, বিষ্ণুশরণ দুবলিশ, রাজকুমার সিং, রামকৃষ্ণ ক্ষত্রী, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামনাথ পাণ্ডে, বানোয়ারীলাল, ও প্রণবেশ কুমার চ্যাটার্জী। পরবর্তী কালে এই মামলায় আসফাকউল্লা খাঁ এবং শচীন বক্সীর নামও আসামী তালিকায় যুক্ত করা হয়। আর বিচার শুরু হওয়ার আগেই মুক্তি দেওয়া হল শীতল সহায়, চন্দ্রধর জুহুরী, চন্দ্রভান জুহুরী, রামদেও শুক্লা, মোহনলাল গৌতম, বাবুরাম গুপ্ত, হরনাম সুন্দরলাল, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্র গুহ, কালিদাস বসু, ধাইরাণ সিং, প্রমুখদের। রাজসাক্ষী দু'জন। বানারসীলাল এবং ইন্দুভূষণ মিত্র।

কাকোরী মামলা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ। এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে অনেকটাই 'প্রতাপ' পত্রিকার জন্য। মামলার জন্য অর্থ লাগবে অনেক। সম্পাদক গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী আবেদন জানিয়েছেন পত্রিকায়। একটি সমিতি গড়ে উঠেছে মামলার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে, আর জনগণের কাছে বিপ্লবীদের কথা পৌঁছে দিতে। 'তাঁরা ডাকাত নন, তাঁরা বিপ্লবী'। 'হে মহান সন্ত্রাসবাদী? অস্থির আদর্শবাদী? ডাকাত? হত্যাকারী? ওহে বিজ্ঞজনেরা, তোমরা কী নামে, কোন গালাগালিতে ওঁদের বিভূষিত করতে চাও? ওঁরা অনেক বড়, অনেক মহান। ওঁরা এই দুনিয়ার মানুষ নয়। ওঁরা স্বপ্নলোকের বাসিন্দা।' (রচনা ঃ গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী)

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ছুটে এসেছেন মোতিলাল নেহেরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থের মতন জাতীয়তাবাদী নেতারা। পন্থজি তো আসামী পক্ষের অন্যতম উকিল হয়েছেন।

এই মামলায় বিচারকের আসনে ছিল আর্চিবল্ড হ্যামিল্টন। বিচারক নয়, কিন্তু আদালতকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিল যে অ্যাসেসরগণ তারা হল আব্বাস সলিম খান, বানোয়ারী লাল ভার্গব, জ্ঞান চ্যাটার্জী এবং মহম্মদ আইয়ুফ। সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন জগত নারায়ণ মুল্লা। আর আসামীদের হয়ে মামলায় লড়েছিলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মোহনলাল সাক্সেনা, চন্দ্রভানু গুপ্তা, অজিত প্রসাদ জৈন, গোপীনাথ শ্রীবাস্তব, আর. এম. বাহাদুরজি, বি. কে. চৌধুরী, এবং কৃপাশঙ্কর হাজেলা। আসফাকউল্লার মামলা চলেছিল খান বাহাদুর আইনুদ্দিন সাহেবের এজলাসে। আসফাকেরও উকিল হাজেলা সাহেব।

আসফাকউল্লার ভগ্নীপতি আব্দুল কাদির সাহেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি চাইছিলেন একজন মুসলমান উকিল দাঁড় করাতে। কিন্তু আসফাক রাজি হননি। আসফাক বললেন, 'হাজেলা সাহেব ছাড়া কাউকেই দাঁড় করাব না।' আব্দুল কাদির সাহেব বললেন, 'হাজেলা সাহেব তো আর্যসমাজী। তিনি তোমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবেন।' আসফাক বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, তাঁর হাতেই এই কাজ হোক।' 'যখন মামলা চলছিল, তখন স্বয়ং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তসুদ্দুক হোসেন সাহেব চেষ্টা করেছিলেন, আসফাক সব স্বীকার করে বিবৃতি দিক। তাহলে ওর জীবন বাঁচবে। কথাটা আমার কাছেও এল। আমি ভাবলাম, উকিল হিসাবে আসফাকের জীবন বাঁচানো আমার কর্তব্য। ভয়ে ভয়ে কথাটা আসফাককে বললাম। দৃঢ়তার সাথে তিনি বললেন, 'হাজেলা সাহেব, অনেক সংগ্রাম করে আপনাকে উকিল নিয়োগ করেছি। দুঃখ হচ্ছে, আপনিও আমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছেন। আপনার উপর আমার অনেক আস্থা। মানুষ আমাকে কী বলবে? আমিই একমাত্র মুসলমান, যে এই কাজে এসেছি। হিন্দুদের মধ্যে ক্ষুদিরামের মতো আরও অনেকে আত্মদান করেছেন।' ভীষণ লজ্জা পেলাম আমি।' (অমর শহিদ আসফাকউল্লা খাঁ ঃ কৃপাশঙ্কর হাজেলা)

বিচারের শুরুতেই লিপিবদ্ধ হল বানারসীলালের বিবৃতি। সেই বিবৃতিতে বলা হল , '১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালের শেষে বা বর্ষাকালের শুরুতে একজন শাজাহানপুরে এসেছিলেন। তিনি 'রায়মহাশয়' বা 'রায় দাদা' নামে পরিচয় দিয়েছিলেন। পরিষ্কার বোঝা যায় তা ছিল তাঁর ছদ্মনাম। ইনি ছিলেন বাংলার ঢাকা জেলার অধিবাসী। শাজাহানপুরে বিপ্লবী সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করাই ছিল তাঁর আসার উদ্দেশ্য। রামপ্রসাদ প্রাদেশিক সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিল। আসফাক-উল্লাহকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করা হয়। রায়মহাশয় বলেছিলেন, ইংরেজদের হত্যা করতে হবে এবং বলপ্রয়োগে তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করে স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র ডাকাতি করে সংগ্রহ করতে হবে। প্রচারের জন্য পুস্তক, পত্রিকা, ইস্তাহার ও অন্যান্য মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হবে। তিনি বলেছিলেন, কেউ কারও নাম জিজ্ঞাসা করবে না, কেউ নিজের নাম বলবে না। যে সদস্য সমিতির ক্ষতিসাধন করবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

বিচার প্রক্রিয়া এগোয়। বিপ্লবীরা ভাবলেশহীন। তাঁরা জানেন হাতের মুঠোয় পেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এতগুলো বিপ্লবীকে ছেড়ে দেবে না। সুতরাং, হয় ফাঁসি, অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তাঁদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে। বাকিটা বিচারের নামে প্রহসন মাত্র। তারা হাসে, গান গায়, মুক্তির পথ কী হবে সেই নিয়ে আলোচনা করে। রাজেন লাহিড়ী বলে, রাশিয়ার কথা, সমাজতন্ত্রের কথা।

রোশন সিং জেলের মধ্যে একটা গাছ লাগিয়েছেন। পিপুল গাছ। রোজ জল দেন সেই গাছে। এই গাছ একদিন বড় হবে। ছায়া দেবে। তার ছায়ায় এসে বসবে বন্দিরা। তখন হয়ত তাঁরা থাকবেন না। বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি বিবাহিত। বয়সেও অনেকটাই বড়; ৩৭ বছর। স্ত্রী আছেন, নাবালক পুত্র, কন্যারাও আছে। ঘটনার দিন তিনি কাকোরীতে ছিলেনই না। কিন্তু বানারসীলালের বিবৃতিতে তাঁর নাম থাকায় এবং অন্য একটি স্বদেশী ডাকাতিতে যুক্ত থাকার কারণে তিনিও বিচারাধীন। কিন্তু তিনিও নিরুদ্বেগ। আদালতে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসেন।

আদালতের কাজে রাজেন লাহিড়ীর কোনো মনোযোগ ছিল না। 'আদালতে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন সেখানে বিচারব্যবস্থা কী ভাবে চলিত, তাহা অনুধাবন করিতে তিনি মোটেই আগ্রহ দেখাইতেন না। তিনি ভাবিতেন যে তিনি তাঁহার কর্তব্য করিয়াছেন, ফলাফল যাহাই হউক না কেন, তাহাতে তিনি অনাসক্ত থাকিবেন।' (স্বাধীনতার সন্ধানে, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কাকোরী মামলার রায়

বিচার শেষ হল। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মারাত্মক। ১৯২৭ সালের ৬ এপ্রিল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়। তাঁরা ব্রিটিশ-ভারতের সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছেন। রায় পড়েন ইংরেজ বিচারক আর্চিবল্ড হ্যামিল্টনঃ It is established that there was within the conspiracy to deprive the kingéôéemperor of the sovereignty of British-India– a conspiracy to commit dacoities with murder. অর্থাৎ, ব্রিটিশ-ভারতের উপর সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছে এরা। যারা সাত-সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে এই দেশকে লুন্ঠন করতে এসেছে, তারাই সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের অভিযোগ তুলছে!

সুতরাং এই ভয়ঙ্কর অভিযোগের শাস্তি যা হওয়ার তাই হল। শাস্তি ঘোষণা করা হল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশন সিং এবং রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ীকে।

আন্দামান সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছিল গোবিন্দচরণ কর, মুকুন্দিলাল গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে।

মন্মথ নাথ গুপ্তকে দেওয়া হল ১৪ বছরের কারাদণ্ড। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণু শরণ দুবলিশ, রামকৃষ্ণ ক্ষত্রী এবং রাজকুমার সিংকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। প্রেম কিষাণ শর্মা, রামদুলারে ত্রিবেদী, রামনাথ পাণ্ডে এবং ভূপেন নাথ সান্যালকে ৫ বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। বনোয়ারী লাল এবং প্রণবেশকুমার চ্যাটার্জীর ৪ বছরের কারাদণ্ড হয়।

আসফাকউল্লা এবং শচীন বক্সীর মামলারও রায় দেওয়া হল। আসফাকউল্লাকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড এবং শচীন বক্সীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

চূড়ান্ত রায়দানের পরে লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেল থেকে বিপ্লবীদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বিভিন্ন কারাগারে। রামপ্রসাদ বিসমিলকে পাঠানো হয় গোরক্ষপুর জেলে, আসফাকউল্লাকে ফৈজাবাদ (অযোধ্যা) জেলে, রোশন সিংকে এলাহাবাদের নৈনি জেলে এবং রাজেন লাহিড়ীকে গোন্ডা জেলে।

এতদিন এঁরা একসাথে ছিলেন। প্রথমে বিপ্লবী সংগঠনের কাজে, পরে লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেলে। এবার ঠিকানা আলাদা। একই যাত্রায় পৃথক ফল। কারও ফাঁসি হবে; কেউ বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, কারো বা কম মেয়াদের জেল। রামপ্রসাদ বিসমিল শাজাহানপুরের নওয়াদার রোশন সিংকে

যুক্ত করেছিলেন। দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ৯ আগস্ট কাকোরীতে ছিলেন না তিনি। তবুও তাঁর ফাঁসি হবে। বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে। রামপ্রসাদ এগিয়ে এসে তাঁর দুটো হাতে চাপ দিলেন। রোশন সিং-এর মুখে তখন প্রশান্তির হাসি। এই তো বিপ্লবীর মতো আচরণ। চলে যাওয়ার আগে জেল কর্তৃপক্ষ সকলের গ্রুপ ফটো তুলল। সে ছবিতে অবশ্য আসফাকউল্লা এবং শচীন বক্সী নেই। ওই দিন তাঁদের মামলা ছিল না।

লক্ষ্ণৌ জেলে আসফাক এবং শচীন বক্সী থাকতেন একই সেলে। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খুব গাঢ়। কিন্তু সাজা হল দুই জনের দু'রকম। আসফাকের ফাঁসি, আর শচীনের যাবজ্জীবন। রায় ঘোষণার পরে শচীনবাবু একা ফিরে এলেন; আসফাককে নিয়ে যাওয়া হল ফৈজাবাদের কনডেমন্ড সেলে। দুঃখ আর যায় না শচীন বক্সীর।

ফাঁসির আদেশ শোনার পরে শিশুর হাসি খেলে গিয়েছিল রাজেন লাহিড়ীর চোখে-মুখে। মন্মথনাথের হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'জীবনটাই পাল্টে গেল আমার।' পরে বাইরে এসে সাথীদের বলেছিলেন, 'আমার শাস্তি তো এক মুহূর্তের ব্যাপার। পাটাতনে উঠব আর তারপর...। আমি ভাবছি তোমাদের কথা। সারা জীবন জেলে কাটানো কী দুঃসহ!'

স্বভাবকবি রামপ্রসাদ গাইতে থাকেন বিস্মিল আজিমাবাদীর গজল, ''সরফরোশি কি তমন্না অব হমারে দিল মে হ্যায়,/ দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু-এ-কাতিল মে হ্যায়।'' (আমাদের অন্তরে শিরচ্যুত হওয়ার প্রবল বাসনা।/ দেখব ঘাতকের বাহুতে কত শক্তি আছে।)

গানের শেষে রামপ্রসাদ আবেগের সঙ্গে বারবার গাইতে থাকেন 'দিল এ বিস্মিল মে হ্যায়', 'দিল এ বিস্মিল মে হ্যায়'।

বিভিন্ন কারাগারে পৌঁছে বিপ্লবীরা দেখলেন কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তারপর তাঁদের সাধারণ বন্দিদের মতো রাখা হয়েছে। তাঁরা রাজনৈতিক বন্দি হলেও, তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। পরের দিনই (৭ এপ্রিল, ২০২৫) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং তাদের জন্য রাজনৈতিক বন্দি-মর্যাদার দাবিতে অনশন শুরু করেন বিপ্লবীরা। রামপ্রসাদ চার দিন অনশন করলেন, রোশন সিং ছয় দিন। তাঁরা আরও বড় সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য অনশন ভঙ্গ করলেও অন্যরা চালিয়ে গেল। মন্মথনাথ গুপ্ত এবং বিষ্ণু শরণ গুপ্ত তো ৪৫ দিন দীর্ঘ অনশন করেছিলেন।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার পুনর্বিবেচনা করতে রাজি হয়নি। এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, মোতিলাল নেহেরু, গোবন্দবল্লভ পন্থ, মদনমোহন মালব্য, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী প্রমুখরা। সাজা কমানোর জন্য প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করা হল। রামপ্রসাদ আবেদন করেছেন শুনে চমকে গেলেন আসফাকউল্লা। 'কিসের আবেদন ? কার কাছে?' ব্যথিত হলেন আসফাক। রামপ্রসাদ অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে কত নির্মম সেটা প্রমাণ করার জন্যই তিনি আবেদন করেছিলেন। আর আসফাক তাঁর আবেদন-পত্র তুলে দিয়েছেন হাজেলা সাহেবের হাতে। তাতে লেখা রামপ্রসাদ নয়, সব পরিকল্পনার দায়িত্ব তাঁর নিজের।

আবেদন খারিজ হয়ে গেল।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান

ফাঁসির নির্দিষ্ট দিন এগিয়ে এল। ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৭ চার বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হবে চারটি ভিন্ন ভিন্ন জেলে। কিন্তু হঠাৎ খবর এল বিপ্লবীরা গোন্ডা জেল ভেঙে ফাঁসির 'আসামী' রাজেন লাহিড়ীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। গোন্ডা জেলের নিরাপত্তা বাকি জেলগুলোর মত কঠোর ছিল না। ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ফাঁসি কার্যকর করার দিনটা দু'দিন এগিয়ে এনে করল ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু রাজেনের ভ্রূক্ষেপ নেই। দাদাকে মানা করে দিলেন শেষ দেখার জন্য আসতে। দিদিকেও মানা করলেন। শেষ পত্রে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী লিখেছেন, 'মৃত্যু কী? ইহা তো জীবনেরই বিকল্প। জীবন কী? ইহা তো মৃত্যুরই অপর একটা রূপ। তাই মৃত্যুকে মানুষ ভয় করিবে কেন? কেনই বা তাহার জন্য দুঃখ অনুভব করিবে? মৃত্যু প্রভাতের সূর্যোদয়ের মতই তো নিশ্চিত। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই মৃত্যুবরণও বৃথা যাইবে না। সকলের উদ্দেশ্যে আমার শেষ নমস্কার রহিল।ত ফাঁসির আগে রাজেন লাহিড়ী হাসছিলেন। ফাঁসির পরেও তাঁর মৃত মুখে সেই হাসি লেগে ছিল।

গোরক্ষপুর জেলে ১৯ ডিসেম্বর প্রভাতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন রামপ্রসাদ বিসমিল। ফাঁসির কয়েকদিন আগে নিজের এক বন্ধুকে বিসমিল লিখেছিলেন, '১৯ তারিখ যা কিছু হতে যাচ্ছে তার জন্য আমি ভালোভাবে প্রস্তুত আছি। সেটা কী ভাবে? কেবল শরীর বদলে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাতৃভূমি তথা তার দীন সন্ততির কাজ করার জন্য নব উৎসাহে আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।' (সূত্র ঃ ভারতের মহান অমর ক্রান্তিকারী আসফাক উল্লা খাঁ, ডঃ ভবন সিং রাণা, পৃষ্ঠা , ১২০)

একই দিনে ফৈজাবাদ জেলে আত্মবলিদান করলেন আসফাকউল্লা। আগের দিনই চুল-দাড়ি কাটিয়েছেন। নিজের

পুরানো কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে পরেছেন। পায়ে জুতো পরেছেন। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ‘কাল আমার বিয়ে’ বলে তাদের সঙ্গে রসিকতা করেছেন। নিজের ফাঁসি দেখার জন্যে হাজেলা সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেছেন। হাজেলা সাহেবের ভাষায়, ‘দেখা শেষ হলে যখন চলে আসছি, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনার কোনো ইচ্ছা আছে, যা আমি পূরণ করতে পারি?’ উনি বললেন, ‘কালকে ফাঁসিতে চড়ব আমি, আমার ইচ্ছা আপনি দেখুন কেমনভাবে ফাঁসিতে চড়ি আমি।’ আমি বললাম, ‘আমার এত সাহস নেই। আপনাকে ফাঁসিতে চড়তে দেখার হিম্মত নেই আমার। কিন্তু আপনার মাজারে যাব আমি। নিশ্চয়ই যাব।’ (সূত্রঃ কাকোরী শহিদ স্মৃতি) ফাঁসির মঞ্চে সোজা উঠে গেলান আসফাক। ফাঁসির রশিকে চুম্বন করে বললেন, ‘আমার হাতে কোনো মানুষের রক্ত লেগে নেই। আমার উপর মিথ্যে দোষ চাপানো হয়েছে। আল্লাহের কাছেই আমার ন্যায় বিচার হবে।’ (সূত্র ঃ ভারতের মহান অমর ক্রান্তিকারী আসফাক উল্লা খাঁ, ডঃ ভবন সিং রাণা, পৃষ্ঠা, ১২২)

রোশন সিংকে ফাঁসি দেওয়া হয় ২০ ডিসেম্বর এলাহাবাদের নৈনি কারাগারে। ফাঁসির আগেও তিনি প্রশান্ত ছিলেন। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বাধীনতার সন্ধানে’ বইতে আছে, ‘‘স্থির, ধীর, প্রশান্ত চিত্তেই রোশন সিং ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিয়াছিলেন। তাহার পর উর্দু ভাষায় লিখিত কবিতার একটি পংক্তি তিনি ধীরে ধীরে স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন, যাহার যথার্থ অর্থ ছিল, ‘রোশন, এই ক্ষণে তোমার জীবন-গৌরবের প্রকৃত মূল্যায়নের শুভ মুহূর্ত সমাগত।’ হ্যাঁ, জীবনের বিরাট অবদান তখনই তিনি সত্যকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন।’’ ◻

প্রাণের উৎস

১৬ পৃষ্ঠার পর

cervate-এরই ‘‘মৃত্যুমুখে পতিত’’ হবার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে একথা ভুললে চলবে না যে chance-এর প্রশ্ন জড়িত থাকলেও একমাত্র এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রোটোপ্লাসম তথা living organism-এর উৎপত্তি ঘটেছে। coa cervate থেকে ‘Jellylike’ প্রোটোপ্লাসমে উত্তরণেরকালে যাকে ‘a drop of that medium in which the first beginnings of living things arpeared’ বলা যায়, Gene chromosome অথবা নিউক্লিয়াস প্লাসাটিড ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে ঘটায় প্রথম দিকে এ সকল বস্তুগুলোর পারস্পরিক পার্থক্য অতটা সূক্ষ্ম ছিল না। যে কারণে আজও এখন অনেক ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায় যার ভেতরে নিউক্লিয়াস একক বস্তু হিসেবে ঘনীভূত অবস্থায় না থেকে সমস্ত protoplasmic mass ছড়িয়ে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা হিসেবে। সুতরাং উত্তরণের কোনও এক ধাপে free moving chormosome nucleus ইত্যাদির প্রাথমিক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের সহায়তায় সাইটোপ্লাসম ও তথা প্রোটোপ্লাসমের সৃষ্ট হয়েছে বলেই মনে হয়।

মোটামুটি সংক্ষেপে এটাই হলো জীবন সৃষ্টির প্রাথমিক ইতিহাস। একটা প্রশ্ন অনেকে করেন যে, নির্জীব জড়বস্তুপিণ্ড থেকেই যদি জীববস্তুর সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এখন আর সেটা প্রকৃতিতে সম্ভব হচ্ছে না কেন। এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমতঃ, আগে পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা, যেটা একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল জীববস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আজকের প্রাকৃতিক অবস্থা তার থেকে আলাদা। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল জৈব পদার্থ জীববস্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, সে সকল আজ যদি বা নৈসর্গিক উপায়ে সৃষ্ট হয় তাহলেও যে সমস্ত living organism-এ পৃথিবীর জল, স্থল পরিপূর্ণ তাদের খাদ্যেই পরিণত হবে সে সকল জৈব পদার্থ অর্থাৎ protein nuclic acid ইত্যাদি। অর্থাৎ জীববস্তুর প্রাথমিক সৃষ্টির একটা অন্যতম condition অন্যান্য কোনও living organism-এর অনুপস্থিতি। এটা পরোক্ষভাবে living organism-এর প্রাথমিক সৃষ্টিকেই সমর্থন করে। ◻

(১৯৬৭ সালের অক্টোবর সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)